রাঘব বোয়াল

আনন্দ কিশোর মুন্সী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-বারো



প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬ চালতাবাগান লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
অহিভূষণ মালিক

দাম : তিন টাকা

শ্রীসাগরময় ও গৌরকিশোর ঘোষ

স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

ডাক্তারের ডায়েরী (তৃতীয় সংস্করণ)

ভেলকি থেকে ভেষজ

পরম লগনে

॥ এক ॥

ভারত বিখ্যাত রাঘব বোয়াল পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা এবং একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীরাঘবচন্দ্র বোয়াল আজ মোক্ষম একটি প্যাঁচে পড়েছেন। কলকাতা ছেড়ে আজই তাঁকে পালাতে হবে, এক্ষুনি এই রাত্রে।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ওপর দোতালায় নিজের আপিসে বসে বোয়াল মশাই তাই একথা ভাবছেন নিজের মাথায় হাত দিয়ে।

যখন তিনি প্রথম আসেন কলকাতায় সেই পঁচিশ বছর আগে, তখন নিজে ছিলেন কপর্দকহীন। কাজেই তখন তাঁকে চালাতে হয়েছে এক বন্ধুর মেসে উঠে; তারই ঘাড়ে চেপে। পরে অবশ্য চালিয়েছেন তিনি ছাত্র পড়িয়ে, আর মাস্টারী করে ইস্কুলে।

এখন তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স। তাঁর এখন গাড়ি আছে, বাড়ি আছে আর আছে বিরাট এই পুস্তক প্রকাশনের কারবার। ভারত বিখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানটি একা তিনি গড়ে তুলেছেন শুধুমাত্র বুদ্ধি, শ্রম এবং অধ্যবসায় দিয়ে। এ ছাড়া অন্য কোনও মূলধন তাঁর ছিল না।

এখন অবশ্য তাঁর মূলধন হয়েছে অনেক। ইচ্ছে হলে এখন তিনি যা খুশি তারই কারবার চালাতে পারেন বিনা শ্রমে, শুধু মাত্র টাকার জোরে।

কিন্তু তাঁর মনে কোনো উৎসাহ নেই; ফুর্তি নেই। নিজের জন্য বাজে খরচ কখনও তিনি করেন না। তাঁর কোনো নেশা নেই। চা সিগারেট কিংবা পান দোক্তা তিনি খান না। তাই আজ নিজের আপিসে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে তিনি শুধু ভাবছেন, এখন কি করা যায়? কলকাতা ছেড়ে আজই তাঁকে পালাতে হবে। কিন্তু তিনি যাবেন কোথা?

বোয়াল মশাই এইমাত্র ডাক্তারের বাড়ি থেকে ফিরেছেন। ডাক্তারটি বিলেত ফেরত এবং হৃদযন্ত্র বিশারদ। ধর্মতলায় তাঁর চেম্বার। ইদানীং বোয়াল মশাইর বুকটা একটু বেশী ধড়ফড় করত বলেই তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন।

এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকটি ভালো করে তাঁকে পরীক্ষা করে বলেছেন, এক্ষুনি তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হবে, সম্ভব হলে আজই রাত্রে। বিশ্রাম নিতে হবে নির্জন এবং নির্ঝঞ্ঝাট কোনো জায়গায়, অন্ততপক্ষে একটি মাস। তা না হলে নাকি বিপত্তি হতে পারে। অর্থাৎ যে বিশ্বস্ত হৃদযন্ত্রটি এই দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর ধরে দিবারাত্র ধুকপুক করে এতদিন কাজ চালিয়ে এসেছে, সেও নাকি হঠাৎ একদিন কাজ বন্ধ করতে পারে, একেবারে বিনা নোটিশে।

তাই বোয়াল মশাই আজ একটু ভাবনায় পড়েছেন।

যদিও ব্যাংকে তাঁর টাকা আছে অনেক; বাড়ি গাড়ি আছে, তবু তিনি অকৃতদার। তাঁর বাবা মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বোয়াল মশাই ছিলেন বন্ধুদের ওপর পরজীবী। কাজেই যৌবনে তাঁর বিবাহ হয় নি। ভেবেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের পছন্দ মত কোনো মেয়েকে তিনি একদিন বিবাহ করবেন।

কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে অর্থাৎ এই রাঘববোয়াল

পাবলিশিং হাউসটি গড়ে তুলতেই তাঁর বয়েস চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল। তখন অবশ্য বিবাহের কথা তিনি ভেবেছেন। এমন কি নাম ভাঁড়িয়ে পাত্রী চাই বলে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনও তিনি দিয়েছিলেন; কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রাশি রাশি দরখাস্ত এবং নানা বয়সের স্ত্রীজাতির বিচিত্র সব ফটো দেখে তিনি হঠাৎ ঘাবড়ে গেলেন। বুকটা তাঁর ধড়ফড় করে উঠল। ভয়ে পাত্রী বাছা তিনি ছেড়ে দিলেন; কিন্তু বুকের ভেতর সেই ধড়ফড়ানিটা আর তাঁর গেল না।

সেই রোগের শুরু। ইদানীং ওটা বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বেড়েছে ব্লাড প্রেসার। তাই তাঁর মেজাজটাও হয়েছে খিটখিটে। ডাক্তারের কথায় আজ সেই মেজাজ আরও বেশী বিগড়ে গেল।

আপিসে বসে তাই তিনি মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন, আর মনে মনে ডাক্তারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছেন।

ডাক্তারের আর কি? ষোলটি টাকা ফি নিয়ে দিব্বি বলে দিল, বিশ্রাম নাও, কলকাতা ছাড়, এক্ষুনি।

তাঁর এই দেহটা কি একটা রেলগাড়ি আর ঐ ডাক্তারটি তার গার্ড? সিটি দিলেন, সবুজ নিশান ওড়ালেন আর অমনি গাড়ি হাওড়া ছেড়ে বর্ধমানে গিয়ে দম নিল?

ডাক্তারের পরামর্শ চিরদিনই এমনি উদ্ভট এবং আজগুবি। দুবেলা এক মুঠো ভাত খাবারও যার পয়সা নেই, তাকেও কিনা অনায়াসে বলে, ফল খাও, দুধ খাও, ডিম মাংস মাছ খাও। আর তাঁকে বলেছে, আজই কলকাতা ছাড়, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।

গত পঁচিশ বছর ধরে কলকাতার বাইরে কখনও তিনি যান নি। এমন কি সেই বোমার হিড়িকের সময়ও না। তাছাড়া এখন আর

দেশে গাঁয়ে যাওয়া যায় না। যাবার উপায়ও নেই কিছু। একে তো সেটা বিদেশ, তার ওপর বোয়াল মশাইয়ের আত্মীয় স্বজনও কেউই আর বেঁচে নেই এখন। কাজেই বাইরে যেতে হলে হোটেলে গিয়েই থাকতে হয়।

দীর্ঘকাল মেসে কাটিয়ে বোয়াল মশাইয়ের ধারণা, তাঁর শরীরে যা কিছু ব্যাধি তার মুলে মেসের ঐ ডাল ভাত। নইলে তাঁর মত শক্ত সমর্থ যার শরীর, ছেলেবেলায় যে ডন বৈঠক ডাম্বেল ইত্যাদি করেছে, সে আজ এমন রোগ-কাতুরে এবং নার্ভাস্ হল কি করে?

তাই কোনো হোটেলে গিয়ে ওঠা, আর হোটেলের রান্না খেয়ে শরীরটাকে আরও বেশী বিব্রত করা তিনি পছন্দ করেন না। সাহসও পান না।

তাহলে তিনি যাবেন কোথা?

এমনি সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। বোয়াল মশাই রিসিভারটা তুলে বললেন, হ্যালো?

ওধার থেকে মেয়েলী কণ্ঠে প্রশ্ন এল, বোয়াল মশাই আছেন?

বোয়াল মশাই গম্ভীর গলায় বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারই নাম, শ্রীরাঘবচন্দ্র বোয়াল।

কিন্তু তাঁর বুকটা আবার ঢিপ ঢিপ করে উঠল। আজকাল প্রায়ই এমনি হয়; বিশেষ করে যখনই তাঁকে কোনো মহিলার সঙ্গে কথা বলতে হয়। মহিলাটি যদি নিজে লেখিকা হন, তাহলে বুকের এই ধড়ফড়ানিটা আরও বেশী বেড়ে যায়।

বোয়াল মশাইয়ের গলা শুনে মহিলাটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, ও আপনিই তাহলে বোয়াল মশাই? আমাকে চিনতে পাচ্ছেন?

আমি মন্দিরা। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল থেকে কথা বলছি। ১০৩ নম্বর ঘর। দয়া করে এক্ষুনি একবার আসবেন এখানে?

বোয়াল মশাই ঘাবড়ে গেলেন। কি সর্বনাশ! আবার হোটেলে গিয়ে দেখা করতে বলে যে!

তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। আজই আমি কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাচ্ছি। ফিরব মাসখানেক পরে। তখন আসবেন, কথা হবে।

এই বলে তিনি ফোনটা নাবিয়ে রেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মন্দিরা নামটি তাঁর জানা। কিছুদিন আগে এই মহিলাটিই ওঁকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, জয়পুর থেকে। তাতে তাঁর এই বিরাট প্রতিষ্ঠান, রাঘব বোয়াল পাবলিশিং-এর প্রশংসা ছিল; আর ছিল তাঁর প্রতি অভিনন্দন। সেই সঙ্গে ছিল বিনীত ছোট্ট একটি অনুরোধ। কলকাতায় যখন ইনি আসবেন, বোয়াল মশাই যেন দয়া করে একবারটি দেখা করার অনুমতি দেন সামান্য এই মন্দিরাকে।

বোয়াল মশাই ঝানু লোক। লোকচরিত্র তাঁর খুব ভাল করেই জানা। তা না হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া যায় না, বিশেষতঃ তাঁর মত নিঃসহায় অবস্থা থেকে। তাই চিঠিখানা পড়েই তার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থটি তিনি ধরে ফেললেন। মহিলাটি নিশ্চয়ই কোন কবি অথবা গল্প লেখিকা। তাঁকে দিয়ে ঐ লেখা ছাপিয়ে নিতে চায়, নিঃখরচায়।

জীবের ধর্ম আত্মরক্ষা। আগে নিজের প্রাণ বাঁচাও, পরে অন্য কথা। এই চিঠি পড়ে বোয়াল মশাইয়ের মনে ঠিক সেই ভাবটিই জেগে উঠল। চিঠির জবাব তাই তিনি আর দিলেন না; কিন্তু নীল

খামে ভরা এই চিঠিখানা যত্ন করে তিনি রেখে দিলেন নিজের গোপন ড্রয়ারের মধ্যে।

কাজেই মন্দিরা নামটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় অনেক দিনের। চিঠির উত্তর যদিও তিনি দেননি কিন্তু নীল রঙের কাগজে মুক্তোর মত হাতের লেখাটি এখনও তাঁর চোখে ভাসে। মন্দিরা নামটি এখনও কানে বাজে।

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে, কাজটা ঠিক শোভন হয় নি। ভদ্রতার খাতিরেও অন্ততঃ একটা উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত ছিল খুবই।

চিঠিখানা বার করে দু একবার কাগজ কলম নিয়ে পরে তিনি বসেও ছিলেন কয়েকবার। কিন্তু লিখতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত লেখা আর যায় নি। আত্মরক্ষার জৈব সেই প্রবৃত্তিটিই এই দুঃসাহসিক কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে বারের পর বার।

একে তো তাঁর মন মেজাজ আজ খুবই খারাপ, শরীরটা তেমন ভাল নেই, তার ওপর ডাক্তার বলেছে বিশ্রাম নিতে, আর কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে। সেই ভাবনাতেই তিনি অস্থির। কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন কিছুই এখনও ঠিক হয় নি। এমনি সময়ে মন্দিরার এই টেলিফোনে তিনি আরও বেশী ঘাবড়ে গেলেন।

ছোট্ট ঐ নীল চিঠিতে ছিল সামান্য একটু বিনীত অনুরোধ। কলকাতায় এলে যেন বোয়াল মশাই ওকে দেখা করার একটু অনুমতি দেন। সেই চিঠিরই জবাব তিনি সাহস করে দিতে পারেন নি। কিন্তু এখন আবার টেলিফোনে বলছে, ওর ঘরে গিয়ে দেখা করতে। তাও আবার গ্রেট ইস্টার্ণের মত অত বড় হোটেলে।

অতএব ?

বোয়াল মশাই মনস্থির করে ফেললেন। কলকাতায় আর একটি মুহূর্তও থাকা নয়।

হোটেলের ভেজাল ডাল ভাত খেয়ে যতই তাঁর অজীর্ণ হোক সেও অনেক ভাল। আজই তিনি চলে যাবেন আসানসোলে; আর ফিরবেন সেই একটি মাস পরে। হয় ডাক বাংলো নয়ত কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবেন।

এই ভেবে আপিসের সব ব্যবস্থা তিনি আজ চটপট সেরে ফেললেন। কড়া হুকুম দিয়ে রাখলেন, তাঁর ঠিকানা যেন ফাঁস করা না হয় কিছুতেই।

যে একটি মাস তিনি বাইরে থাকবেন, সেই সময়ে রয়ালটি বাবদ লেখকদের কাউকেই কিছু দেওয়া হবে না, শুধু মাত্র দুটি একটি নামী লেখক বাদে। এঁরা যখনি যা চাইবেন তাই কিন্তু দিতে হবে তক্ষুনি। এমন কি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে যদি দিয়ে আসতে হয় তাহলেও তা দেওয়া চাই সেই মুহূর্তে। মনে রাখতে হবে এই প্রতিষ্ঠানের এঁরাই হলেন স্তম্ভ। কাজেই এঁদের যেন তুষ্ট রাখা হয় সর্বদা।

লেখকরা প্রায়ই এসে জিজ্ঞাসা করে, তাদের বই কত কাটল। এই হিসাবটি গোপনীয়। বলতে গেলে বোয়াল মশাইর এইটেই হল টপ সিকরেট অর্থাৎ সব চেয়ে বেশী গোপনীয় ব্যাপার। সঠিক এই খবরটি বোয়ালমশাই ছাড়া অন্য কোন কর্মচারী কখনও তা জানতে পারে না। সামান্য কিছু জানলেও তা নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার নেই কারো বোয়ালমশাইর আপিসে। এই নিয়মটি সামরিক বিধির মতই নির্মম এবং কড়া। এই বিষয়ে কর্মচারীদের কৌতূহল কখনও তিনি বরদাস্ত করেন না। কাজেই এই একটি মাস

কোনও লেখকই এই খবরটি আর পাবে না তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত।

যে উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণ হওয়ার সময় হয়েছে তার লেখককে তাগাদা দিতে হবে নতুন আর একটি উপন্যাসের জন্য। যতক্ষণ নতুন আর একটি লেখা তিনি না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর বই চেপে রাখতে হবে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে। লেখকের প্রাপ্য টাকাও আটকে রাখতে হবে, নতুন আর একটি লেখা না দেওয়া পর্যন্ত। বিজ্ঞাপন চলবে শুধু সেই ক'টি বই-এর যার নাম তিনি আলাদা করে লিখে যাচ্ছেন।

অর্থাৎ ব্যবসায় রক্ষার জন্য অবশ্য করণীয় এই ধরণের যাবতীয় জরুরী নির্দেশ যথাযথভাবে দিয়ে টাকা পয়সার সব বন্দোবস্ত করে যেই বোয়াল মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠবেন বলে ভেবেছেন অমনি মন্দিরা এসে ঘরে ঢুকল।

বলল, আপনিই তো বোয়ালমশাই? আমি মন্দিরা।

বোয়ালমশাই হকচকিয়ে গেলেন। বুকের মধ্যে আবার তাঁর সেই ঢিবঢিবি শুরু হল।

মন্দিরাকে দেখে ওর বয়েস যে ঠিক কত তা বোঝা সহজ নয়। বোয়ালমশাইয়ের মনে হল, ওর বয়েস ত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ, তার বেশী কখনও হবে না, হতে পারে না।

দীর্ঘকাল বাংলা দেশের বাইরে থেকে যৌবন এখনও ওর অক্ষত এবং অটুট। দিব্বি সুন্দর শক্ত গড়ন—আঁটসাট চেহারা। পরণে শাদা ভয়েলের মিহি শাড়ি, গায়ে শাদা মিহি সুতোর ব্লাউজ। ডান হাতে সরু এক গাছা চুরি। বাঁ হাতের মণিবন্ধে সোনার ছোট একটি হাতঘড়ি।

বোয়াল মশাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিহ্বল

হয়ে। একটি কথাও বেরোল না তাঁর মুখ দিয়ে। অতর্কিতে মন্দিরার আবির্ভাবে তিনি হঠাৎ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কাঁধে ঝোলানো হাত ব্যাগটি অপূর্ব এক ভঙ্গি করে টেবিলের ওপর রেখে দিল মন্দিরা। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বিলোল কটাক্ষ হেনে মধুর একটু হেসে আবার প্রশ্ন করল মন্দিরা, আপনিই তো বোয়াল মশাই?

বোয়াল মশাইয়ের ব্যবসা পুস্তক প্রকাশনের। তাঁর ঘর কাগজ-পত্র ফাইল আর বইএর স্তূপে ভরা। ঘরে তাই পুরোনো বইএর গন্ধ। সেই গন্ধ ছাপিয়ে টাটকা তাজা রজনী গন্ধার সুমধুর সৌরভে সারা ঘর আজ ভরে গেল।

এই গন্ধে বিমোহিত হয়ে বোয়ালমশাই বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু বুকের ভেতরটা আবার তাঁর দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল।

মন্দিরা নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসে ছোট্ট একটি নমস্কার করে বলল, আমি মন্দিরা। চিনতে পাচ্ছেন?

বিলক্ষণ! বোয়ালমশাই যদিও এখন একটু অসুস্থ, বুকটা তাঁর এখনও বেশ ঢিব ঢিব করছে; তবু লেখক কিংবা লেখিকা চিনতে ভুল হবে, এমন অবস্থা এখনও তাঁর হয় নি। চিনতে তিনি ঠিকই পেরেছেন। আর টেলিফোনেই ওটা বুঝেচেন বলেই কলকাতা ছাড়বার সংকল্প করেছেন; এমন কি হোটেলের জঘন্য খাওয়া খেতে রাজী হয়েছেন পর্যন্ত। আর মাত্র দুটি মিনিট সময় পেলেও তিনি পালিয়ে যেতে পারতেন। এক মুহূর্ত আগেও যদি দরজার ফাঁকে তাঁর চোখ পড়ত, শুধু যদি শাড়ির আঁচলটুকু অথবা শাড়ির প্রান্তে ঐ পা দুখানিও একবারটি তাঁর নজরে পড়ত, তাহলেও আর বোয়াল

মশাই এমনি করে ধরা পড়তেন না। টেবিলের নিচে গিয়ে তক্ষুনি তিনি আত্মগোপন করে বসে থাকতেন, কত সহজে।

কিন্তু এখন ?

সমস্ত ঘরটা রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে ভরা। বোয়ালমশাই কোনো কথা না বলে শুধু মন্দিরার দিকে তাকিয়ে রইলেন নিতান্ত অসহায় হয়ে।

ভারত বিখ্যাত এতবড় একটি প্রকাশককে এমনি করে ওর দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মন্দিরার মনে হল, ওর আশা আজ সার্থক হয়েছে, ওর বয়সোচিত এই প্রসাধনে কাজ হয়েছে। রাঘববোয়াল আজ ঘায়েল হয়েছেন।

॥ দুই ॥

গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের ১০৩ নম্বর ঘরে মন্দিরা আজ বেলা তিনটে থেকেই ঘরদোর ফিটফাট করে নিজে সেজে বসে আছে। বয়কে বলা আছে, দুজনের জন্য চা দিতে হবে বেলা ঠিক চারটের সময়। বোয়াল মশাই তখন এখানে আসবেন। গতকাল সন্ধ্যায় এই কথাটি আদায় করে তবে মন্দিরা উঠেছে।

মন্দিরা জানে বোয়াল মশাই ঠিক সময়েই আসবেন। গতকালকার কথা খেলাপ করবার সাহস তাঁর আজ হবে না। লোকটি ভারী অদ্ভুত। এত বয়েস হয়েছে তবু মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন ওঁর সঙ্কোচ হয়, বাধো বাধো ঠেকে। দেখে মন্দিরার হাসি পেয়েছিল খুবই। কিন্তু সে হাসে নি। ঐ সময়ে হেসে ফেললে আজ আর বোয়াল মশাই এখানে আসতে রাজী হতেন না কিছুতেই।

নিজের দেহ সৌষ্ঠবের প্রতি মন্দিরা খুব বেশী সজাগ এবং সচেতন। তাই ওর ধারণা যে কোনও পুরুষের ওপরই ও প্রভাব বিস্তার করতে পারে অনায়াসে। কাজেই বোয়াল মশাই যে ঘায়েল হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

যদিও আজ প্রায় পাঁচ বছর স্বামীর সঙ্গে মন্দিরার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে গেছে আজ চার বছর হল, তবু নিজের মোহিনী শক্তির প্রতি আত্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্রও

তার কমেনি ; এখনও সে বিশ্বাস তার আগের মতই ঠিক অটুট আছে। ও জানে আজ যদি ও ইচ্ছে করে, যে কোন উপযুক্ত শিক্ষিত এবং বিত্তবান পুরুষকে বিবাহ করে অনায়াসে আবার সে ঘর-সংসার পাততে পারে।

কিন্তু সেদিকে মন্দিরার মন নেই। ওর মন এখন সাহিত্যে। গত চার বছরে পাঁচখানা উপন্যাস এবং পঞ্চাশটি ছোট গল্প ও লিখে ফেলেছে ; কিন্তু আজও তা ছাপানো হয় নি। এজন্যই মন্দিরা কলকাতায় এসেছে এবং গতকাল বোয়াল মশাইয়ের ওপর তার যৎসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে নিজের পরিকল্পনা মত।

একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে মন্দিরা ভাবছিল, বোয়াল মশাইকে দিয়ে এই লেখাগুলো প্রকাশ করবার সব চেয়ে সহজ উপায় কি ? লোকটি খুবই নার্ভাস প্রকৃতির এবং রোগকাতুরে। অথচ ব্যবসায়ে বেশ ধূর্ত। মন্দিরা পাঁচ মিনিটের আলাপেই তা বুঝে নিয়েছে। কাজেই সুযোগ বুঝে এমন সময় এই কথাটি পাড়তে হবে যখন আর তিনি না বলতে পারবেন না।

মন্দিরা ঠিক করেছে বোয়াল মশাইকে আজই ওর আগড়পাড়ার বাড়িতে নিয়ে যাবে ; বিকেলে চা খাবার পর।

একবার ওখানে নিতে পারলে, একবার কিছুদিন ওখানে রাখতে পারলে মন্দিরার কাজ জলের মত সহজ হয়ে যাবে। যে জাল তখন মন্দিরা ফেলবে, তা কেটে বেরিয়ে আসা রাঘব বোয়ালেরও কর্ম নয়।

আগড়পাড়ার বাড়িটি মন্দিরার পৈতৃক সম্পত্তি। মন্দিরাই তার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। ওর বাবা মার মৃত্যু হয়েছে আজ প্রায় চার বছর হল। তখন মন্দিরার সবে মাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে।

ঐ নিয়ে বাবা মার সঙ্গে সামান্য কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল বলেই এতদিন আর এ বাড়িতে আসে নি মন্দিরা।

এখন এসেছে নিজের গরজে। প্রথমত মন্দিরা দেখেছে বিদেশ থেকে গল্প লিখে বাংলার কাগজে ছাপানো খুবই কঠিন। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকরা কোনো পাত্তা দেন না। গল্প পাঠালে তা ফেরৎ আসে। আর প্রকাশকরা নামকরা লেখকের পেছনেই ছোটেন, নতুন লেখকের চিঠির পর্যন্ত জবাব দেন না। তাই ও ভেবেছে নিজে এসে একবার চেষ্টা করে দেখবে, ওর লেখা ছাপা হয় কি না।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, মন্দিরার মেয়ের জন্য একটি পাত্র খোঁজা। এই মেয়েটি এখনও কলেজে পড়ে। দিল্লী থেকে এই বছর আই-এ-পাশ করবার পর মন্দিরা ওকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে। বেথুন কলেজে ভর্তি করে হস্টেলে রেখেছে। এই মেয়েটির বয়স যদিও মাত্র উনিশ বৎসর, তবু মন্দিরা ভাবে এখন থেকেই চেষ্টা না করলে বিয়ে হতে দেরী হবে। বি. এ. পাশ করে রুবি হয়ত চাকরি করতে চাইবে। কিংবা হয়ত অপদার্থ কোন ছোকরার সঙ্গে ভাব করে বিয়ে করে বসবে। ইতিমধ্যেই পাড়ার একটি বেকার ছোঁড়াকে রুবির বোধ হয় ভাল লেগেছে। মন্দিরা তা চায় না। রুবির ভালোর জন্যই চায় না।

অথচ বাংলার বাইরে থেকে ভাল বাঙালী ছেলে পাওয়া খুব কঠিন। তাই মন্দিরা কলকাতায় এসেছে। আগড়পাড়ার ঐ বাড়িটা মেরামত করে নিজের পছন্দ মত সাজিয়ে নিয়েছে। দু'-এক দিনের মধ্যেই রুবির পূজোর ছুটি। এই ছুটিতেই কোনো ভাল ছেলে দেখে মন্দিরা রুবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

মনে মনে এই সব পরিকল্পনা করে মন্দিরা কাল আগড়পাড়া

থেকে কলকাতায় এসে এই হোটেলে উঠেছে। ভাগ্যিস কালই ও বোয়ালমশাইকে ধরেছিল। একটা দিন দেরী হলেই সব ভণ্ডুল হয়ে যেত। রাঘব বোয়াল ফস্কে যেত, অন্ততঃ একটি মাসের জন্য।

কালকের সন্ধ্যার কথা ভেবে আজ মন্দিরার হাসি পেল। ঘড়িতে দেখল, চারটে প্রায় বাজে। তাড়াতাড়ি সোফা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মন্দিরা মুখে একটু পাউডার ঘসে নিল, চুলটা ঠিক করে, ফুলদানি থেকে একটি ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল হাসি হাসি মুখে।

দেখল বোয়াল মশাই আসছেন, আশেপাশের ঘরগুলির নম্বর খুঁজে খুঁজে।

মন্দিরা এগিয়ে এসে বলল, এই যে বোয়াল মশাই, আসুন, এই ঘরে।

বোয়াল মশাই পঁচিশ বছর ধরে কলকাতায় আছেন কিন্তু এই গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে জীবনে কখনও ঢোকেন নি। প্রয়োজনও যেমন হয় নি, সুযোগও তেমনি ঘটে নি। ওঁর ধারণা ছিল স্যুটবুট না পরলে এখানে আসা যায় না। তাই মন্দিরা যখন কাল তাঁকে আসতে বলল, তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন, কিন্তু কোট প্যাণ্ট তো আমি পরি না! ওখানে যাব কি করে?

তাঁর ঐ কথা শুনে মন্দিরা তখন বলেছিল, ওসব কিছু লাগবে না। আপনি যে পোশাকে আপিসে আসেন, সেই পোশাকেই আসবেন। দেখবেন কেউ কিছু বলবে না।

সত্যি আজ যখন তিনি এই হোটেলে ঢুকে একতলায় এনকোয়েরিতে জিজ্ঞাসা করলেন ১০৩ নম্বর ঘরটা কোথায়, তক্ষুনি একজন বলে দিল, তিন তলায়। লিফটে উঠে চলে যান।

মন্দিরা তার সঙ্গে যতটুকু কথাবার্তা বলেছে তার মধ্যে ঘোষাল মশাই এখনও কোনো দোষ পান নি। কোনো চাতুরি কিংবা অন্য কোনো মতলবের আভাষ পর্যন্ত তাঁর নজরে পড়ে নি। বরং এই মহিলাটির কথায় যেন বেশ একটা সহজ সরল স্বাভাবিক ভাব আছে। সহানুভূতি আছে।

তাঁর অসুখের কথা শোনা মাত্রই কাল কেমন ছুটে এসে বললেন, এত দিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করব আশা করে আছি অথচ আজই আপনি অসুখের জন্য বাইরে যাচ্ছেন শুনে একবারটি না এসে আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, একটুখানিও সাহায্য যদি কিছু করতে পারি। কিন্তু দেখছি আপনি সত্যি ভারী অসুস্থ। এই শরীর নিয়ে বাইরে যাওয়া কি ঠিক হবে?

কাজেই তিনি বলেছিলেন, কি করব বলুন! সহরের সবচেয়ে বড় হার্ট স্পেশালিস্ট বলেছে, আজই কলকাতা ছাড়তে হবে, এক্ষুনি। বিশ্রাম নিতে হবে নির্জন এবং নির্ঝঞ্ঝাট কোনো জায়গায়, পুরো একটি মাস।

শুনে মন্দিরার অমন জ্বলজ্বলে মুখখানা নিমেষে যেন শুকিয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, তাই নাকি? হার্টের অসুখ? তাহলে তো সত্যি খুব ভাববার কথা। তা আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন কে? কোথায় যাবেন?

সহানুভূতি ভরা এই কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর বুকের ঢিবঢিবিটা হঠাৎ যেন কমে গেল। তিনি স্বাভাবিক ভাবে হেসে বললেন, সঙ্গে আবার কে যাবে? একলাই যাব। থাকব কোনো হোটেলে।

মন্দিরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখদুটি বড় বড় করে

জিজ্ঞাসা করল, সে কি? আপনার স্ত্রী আপনাকে একা ছেড়ে দেবেন? এই শরীরে?

এই কথায় বোয়ালমশাই খুবই কৌতুক বোধ করলেন। হেসে বললেন, স্ত্রী থাকলে তো আটকাবেন?

বোয়াল মশাইয়ের এক একটি কথা যেন মন্দিরার কাছে নতুন একটি বিস্ময়। বিস্ময়ের পরে বিস্ময়। মন্দিরা যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

বলল, তাহলে কি আপনি বিপত্নীক?

মন্দিরাকে বারবার এমন করে অবাক হতে দেখে বোয়াল-মশাইয়ের আরও বেশী মজা লাগল।

তিনি বললেন, আজ্ঞে না। এই ব্যাবসা নিয়েই তো বুড়ো হয়ে গেলাম। বিবাহ করবার আর সময় পেলাম কৈ? ঠাকুর চাকর নিয়ে বাড়িতে আমি একা থাকি। তাদের কাউকে নিয়ে গেলে বাড়ি দেখবে কে?

এতক্ষণে মন্দিরা ব্যাপারটা সব বুঝে ফেলল। অসুস্থ প্রৌঢ় এই ভদ্র লোকটি নিতান্ত নিঃসঙ্গ এবং একা। অপরিসীম মমতায় মন্দিরার মনটা তাই এখন ভরে উঠল।

মন্দিরা বলল, তাহলে বোয়াল মশাই, আমার একটা কথা রাখুন। আমি এমন একটি জায়গা আপনাকে ঠিক করে দেব, যেখানে আপনার কোনো কষ্টই হবে না। নির্জন নির্ঝঞ্ঝাট একটি বাগান-বাড়ি। ঠাকুর চাকর মালী সব আছে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। কলকাতা থেকেও খুব কাছে। ভালো না লাগে চলে আসবেন। বলুন আপনি রাজী?

মনে মনে বিকেল থেকে যা কামনা করে বার বার বোয়াল

মশাই ব্যর্থ হয়েছেন, বিশ্রামের এমন একটি উপযুক্ত জায়গা সারাক্ষণ খুঁজে পেতেও যা তিনি বার করতে পারেন নি, তাই আজ এই মহিলাটি হঠাৎ তাঁর হাতের কাছে নিয়ে এলেন এমনি করে অনায়াসে।

বোয়াল মশাই সহসা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

গদগদ হয়ে বললেন, দেখুন হোটেলের ভাত খেতে আমার বড্ড ভয় করে। এমনি একটি নির্জন জায়গাই আমি খুঁজছিলাম। বলুন দেখি কবে এটা পাওয়া যাবে, আর এক মাসের জন্য কি দিতে হবে?

মন্দিরার মুখে তখন যে হাসিটি ফুটে উঠেছিল, বোয়াল মশাই কখনও তা ভুলবেন না। নিকটতম আত্মীয় অথবা বন্ধু ছাড়া এমন তৃপ্তির হাসি আর কেউ হাসতে পারে না কখনও।

মন্দিরা বলেছিল, তাহলে এক কাজ করুন। কাল বিকেল ঠিক চারটের সময় আমার হোটেলে আসুন ১০৩ নম্বর ঘরে। আমার সঙ্গেই চা খাবেন। তখনই সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।

বোয়াল মশাই চা খান না। কিন্তু সেই কথাটা এখন আর তিনি বলতে পারলেন না। মনে হল, এক্ষুনি ওটা বলে তালটি হঠাৎ কেটে দেওয়া মোটেই কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বন্দোবস্ত যা করবার চারটের আগেই মন্দিরা সব করে ফেলবে। তখন গিয়ে না হয় এই কথাটা বলা যাবে।

তাই তিনি একথা না তুলে শুধু স্যুট বুট এবং পোশাকের কথাই তুলেছিলেন।

তাতেও মন্দিরা হেসেছিল। তখন কিন্তু খুবই ভাল লেগেছিল বোয়াল মশাইর মন্দিরার সেই কৌতুকভরা হাসি।

তিনি যদিও আগেই শুনেছিলেন যে সাহেবী হোটেলে আজকাল আর সাহেবী পোশাক লাগে না, তবু তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করেছে

খুবই। মন্দিরার কথায় সাহস পেয়ে তিনি ধুতি পাঞ্জাবি পরেই এসেছেন, কিন্তু সবই তা খোপ দুরস্ত এবং সদ্য পাট ভাঙ্গা। এমন কি জুতো জোড়া পর্যন্ত তিনি পালিসওয়ালাকে দিয়ে ঝকঝকে করে এনেছেন।

কিন্তু এখন মন্দিরার ডাক শুনে ফিরে তাকিয়ে মন্দিরার পোশাক দেখে বোয়ালমশাইর মাথাটা আবার হঠাৎ ঘুরে গেল। বুকের ভেতরে আবার সেই ঢিবি ঢিবিটা শুরু হল। সারাদিন এই জিনিসটি আর হয় নি। তাই তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন।

মন্দিরা এগিয়ে এসে ডেকে বলল, এই যে বোয়ালমশাই ! আসুন এদিকে। এই ঘরে।

গতকাল মন্দিরার পোশাকটি ছিল ধবধবে শাদা এবং বেশ স্নিগ্ধ। বোয়ালমশাইর খুবই তা ভাল লেগেছিল।

আজ দেখলেন, মন্দিরা এক মোহিনী সাজে সেজেছে। অন্ততঃ তাঁর চোখে ঐ রকমই মনে হল। নাইলনের ফিকে গোলাপী রঙের শাড়ি আর হাত কাটা এবং পেট খোলা সবুজ রঙের ব্লাউজ। মন্দিরার বয়সী কোন বাঙ্গালী মহিলার এমন উদ্ধত যৌবন, এমন মোহিনী সাজ বোয়ালমশাই আগে কখনও দেখেন নি।

তাই তিনি একটু দমে গেলেন। তাঁর মনে একটা খটকা লাগল। বুকটাও উঠল ঢিব ঢিব করে। মনে হল, কেন এই চোখ ধাঁধানো সাজ ?

কিন্তু মন্দিরার কথায়, অতি সহজ বন্ধুর মত ব্যবহারে ওর এই উগ্র পোশাকের কোনো অর্থ অথবা কোনো মিল, এমন কি বিশেষ কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত বোয়ালমশাই পেলেন না। তাঁর মনে হল, মন্দিরা তার যৌবন সম্বন্ধে যেমন উদাসীন, তেমনি তার পোশাক সম্বন্ধেও।

এ যেন তার স্বভাব-জাত। এ নিয়ে তার যেমন কোনো কৌতূহল নেই, তেমনি কোন প্রত্যাশাও নেই। অর্থাৎ এই পোশাক কোনো পুরুষের চোখ ধাঁধায় কি ধাঁধায় না, তাই নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

বোয়ালমশাইর মনে যে খটকাটি আগে লেগেছিল আবার সেটি কেটে গেল ধীরে ধীরে। বুকের ভেতরটাও শান্ত হল অনেকটা।

মন্দিরার কথায় ঘরে ঢুকে একটা সোফায় তিনি বসলেন।

মন্দিরা বলল, আপনাকে আজ কিন্তু খুব ভাল দেখাচ্ছে। মনেই হয় না, আপনি অসুস্থ। শরীরটা নিশ্চয়ই আজ ভাল, তাই না?

কথাটা মিথ্যে নয়। আজ সারাটা দিন তিনি ভালই ছিলেন। একবারও বুক ধড়ফড় করে নি আজ সকাল থেকে; অসুস্থও বোধ হয় নি কখনও, এখানে আসার আগে পর্যন্ত। মন্দিরার চোখ ধাঁধানো দারুণ ঐ সাজটি দেখেই যা একটু মাথা ঘুরে কাঁপুনি ধরেছিল বুকে। তাও তো তিনি সামলে নিয়েছেন। কাজেই তিনি ভাল আছেন বৈকি!

তাই তিনি হেসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ভালই আছি আজ। তারপর ঐ বাড়িটার কি হল?

মন্দিরা বলল, বাড়ি ঠিকই আছে। চলুন না, একবার দেখে আসবেন। যদি পছন্দ হয় আজই তাহলে কথা পাকা করা যাবে।

এ কথাও বোয়াল মশাইর খুবই যুক্তি সঙ্গত মনে হল। খুশি হয়ে বললেন, বেশ তো তাই চলুন তাহলে। কখন যাবেন?

মন্দিরা বলল, চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া যাক। আপনার তো গাড়ি আছে সঙ্গে। সব ঠিকঠাক করে সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে পারবেন।

বোয়াল মশাই রাজী হয়ে বললেন, বেশ তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিন তাহলে। আমার আবার ওসব পাট নেই। চা খেলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। অথচ কত লোক তো দেখি, দুপুর রাতেও চা খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়।

আশ্চর্য হয়ে মন্দিরা বলল, ওমা তাই নাকি? আমি যে আবার দুজনের মত চা দিতে বললাম।

এমনি সময়ে বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। মন্দিরা সোফার সামনে ছোট্ট টেবিলটি দেখিয়ে বলল, উসকো ওপর রাখো। ঔর ঠাণ্ডা অরেঞ্জ এক গ্লাস লাও জলদি।

বেয়ারা সেলাম করে বেরিয়ে যাবার পর একটা প্লেটে খাবার তুলে হেসে মন্দিরা বলল, তাহলে আপনি এসব খান। আমি এক কাপ চা ঢেলে নিই। আমার আবার চা না হলে চলে না; মাথা ধরে।

বোয়াল মশাই প্লেটটি নিয়ে হেসে বললেন, সব নেশারই ঐ ধর্ম। না হলে মাথা ধরে। তাই ওটি আমি ধরি নি।

এমনি সময় বয় ট্রেতে করে ঠাণ্ডা অরেঞ্জ স্কোয়াস নিয়ে এল। গ্লাসটি ট্রে থেকে তুলে বোয়াল মশাইর দিকে এগিয়ে দিয়ে বিদ্রূপের ছোট্ট একটি কটাক্ষ হেনে মন্দিরা বলল, এই নিন ঠাণ্ডা সরবত। গরম চা যখন আপনার চলে না, ঠাণ্ডা জিনিস চলবে তো? নাকি ঠাণ্ডা লেগে দাঁত কণকণ করবে, সর্দিকাসি হয়ে গলা ব্যথা হবে?

বোয়াল মশাই হেসে উঠলেন।

আজকের এই চায়ের পর্বটা এমনি করে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে যে শেষ করতে পারবেন আগে তিনি কখনও তা ভাবেন নি। কাল যখনি মন্দিরা চা খেতে তাঁকে ডেকেছে তখন থেকেই তাঁর

মনে সংশয় ঢুকেছে। মনটা খুবই খুঁত খুঁত করেছে সারাদিন ধরে।

বাড়িটা ঠিক হবার আগে সামান্য এই চা খাওয়া নিয়ে মন্দিরাকে ক্ষুণ্ণ করতে তিনি চান নি। তাই তাঁর মনে শঙ্কা ছিল। ভয় ছিল।

এখন হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারটা উৎরে গেল দেখে তিনি খুবই প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন।

ঠাণ্ডা সরবতের গ্লাসটি মন্দিরার হাত থেকে নিয়ে ঢক ঢক করে তিনি খেয়ে ফেললেন।

বললেন, আমি বুড়ো হতে পারি কিন্তু আপনি যতটা ভাবছেন, ঠিক ততটা নই।

মন্দিরাও চা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, চলুন তাহলে বাড়িটা দেখে আসি। বাড়িও দেখা হবে, হাওয়াও খাওয়া যাবে।

বোয়াল মশাই হেসে বললেন, চলুন।

॥ তিন ॥

কয়েকদিন পরের কথা। বোয়াল মশাই মন্দিরার আগড়পাড়ার বাড়িতে প্রাতরাশ শেষ করে আরাম কেদারায় বসে আছেন, পুকুরের ধারে গাছের তলায়। ঠিক বসে তিনি নেই; হেলান দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে তিনি যেন শুয়েই আছেন। দেহ মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম যাকে বলে তাই তিনি আরাম করে উপভোগ করছেন মন্দিরার এই বাড়িতে এসে।

আশ্বিন মাস। সূর্যের আর এখন সে তেজ নেই। পুকুরের জলে স্তিমিত সূর্যের আলো পড়ে রুপোর পাতের মত চিক চিক করছে। ভাদ্র মাসের অসহ গরম কেটে গিয়ে মৃদু মন্দ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

গদি আঁটা আরাম কেদারায় দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে বোয়াল মশাই ভাবছেন, স্বর্গ যদি সত্যি কোথাও থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তা এখানে।

অথচ এই স্বর্গসুখ আর একটু হলেই তাঁর হাত থেকে ফস্কে যেত; প্রায় গিয়েই ছিল বলা যায়।

মন্দিরার কাছে খবর পেয়ে এইজন্যেই অর্থাৎ এই স্বর্গসুখ আশা করেই যদিও তিনি বাড়ি দেখতে রাজী হয়েছিলেন, তবু গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল থেকে মন্দিরাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠার মুখেই তিনি একটা

ধাক্কা খেলেন। রাস্তা ভরা লোক হাঁ করে মন্দিরার দিকে তাকিয়ে রইল, এমন কি তাঁর পুরনো ঐ ড্রাইভারটি পর্যন্ত। বোয়াল মশাই লক্ষ্য করলেন, লোকগুলি মন্দিরাকে যে চোখে দেখছে, তাঁকে দেখছে ঠিক অন্য চোখে। বিস্ময়, ঈর্ষা এবং হিংসা মেশানো লোকচক্ষুর এই কুটিল দৃষ্টির সামনে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

মন্দিরাকে আজ যখন তিনি দেখেন, ঐ গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের বারান্দায়, তখনও অবশ্য মাথাটা তাঁর ঘুরে গিয়েছিল একটু ; বুকেও ঢিবঢিবি শুরু হয়েছিল বেশ, তবু কিন্তু ঘরে ঢুকে সহজ আলাপে তিনি শান্ত হতে পেরেছিলেন।

এখন রাস্তাসুদ্ধ লোককে অমন করে তাকাতে দেখে বোয়াল মশাইর বুকটা আবার তেমনি ধুকপুক করে উঠল। মনে হল, মন্দিরার পাশে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। মানান সইও নয়।

কাজেই তিনি ভাবলেন, ড্রাইভারের পাশে গিয়েই বসবেন। কিন্তু সে সুযোগও মন্দিরা তাঁকে দিল না। নিজে পেছনের সিটে বসেই বলে উঠল, ভাবছেন কি ? উঠে পড়ুন শিগগির।

অগত্যা তাঁকে মন্দিরার পাশেই বসতে হল, কিন্তু তবু তিনি পাশাপাশি ঠিক বসলেন না ; বেশ একটুখানি সরে ডানদিকের দরজা ঘেঁষে বসলেন তিনি। গাড়ি ছুটে চলল। বৌবাজারে ঢুকে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউতে এসে শ্যামবাজারের দিকে বাঁক নিল। কিন্তু গাড়ি যখনি কোথাও থামে পুলিসের নির্দেশে কিংবা ভিড়ের চাপে, সেখানেই রাস্তার সব লোক মন্দিরার দিকে যেন কেমন একরকম করে তাকায়। বোয়াল মশাই মনে মনে দারুণ এক অস্বস্তি বোধ করেন।

মন্দিরা কিন্তু নির্বিকার। লোকচক্ষুর এই কৌতূহল সম্পূর্ণ

উপেক্ষা করে সে তার নিজের কথা নিয়েই মত্ত। কলকাতায় আজকাল বড্ড বেশী ভিড়, ফুটপাথ দিয়ে চলা যায় না, গাড়ি চড়েও সুখ নেই, খোলা ট্যাকসি সব উঠে গেছে, এমনি সব আজে বাজে কথা বলতে বলতে এক সময় তাঁর দিকে ফিরে মন্দিরা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—

আচ্ছা বোয়াল মশাই, আপনি এতদিন বিয়ে করেন নি কেন?

কালকে যে কথার তিনি উত্তর দিয়েছিলেন অত সহজে, আজ আর সে কথা তাঁর মুখে এল না। বলতে পারলেন না, ব্যাবসা নিয়েইত জীবন কেটে গেল, ও সবের আর সময় পেলাম কৈ?

আজ তাঁর মনে হল, মন্দিরা যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নি শিখা। একদা যে শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে না জানি কত প্রাণ ধ্বংস করেছে, আজ যদিও তা কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে, তবু তার উত্তাপ আছে। সেই উত্তাপ তাঁর গায়ে এসে লাগছে, চোখে মুখে কানে তার ঝাঁঝ তিনি টের পাচ্ছেন জানলার ধারে সরে বসা সত্ত্বেও।

মন্দিরার প্রভাব বড্ড বেশী কড়া। যৌবন ওর সযত্নে রক্ষিত; এবং প্রসাধনে মার্জিত। বিচিত্র পোশাকে পরিস্ফুট ওর অঙ্গ সৌষ্ঠবে গন্ধ দ্রব্যের মাদক সুরভি।

বোয়াল মশাইর মনে হল, তাঁর এই বয়সে, বিশেষ করে দুর্বল এই হৃদযন্ত্রে এত বেশী মাদক দ্রব্য এখন আর সইবে না!

অতএব?

তক্ষুনি তিনি মনস্থির করে ফেললেন, মন্দিরার সঙ্গ আর নয়। বাড়ি যত ভালোই হোক, তিনি আর তা নিচ্ছেন না। বাঁচতে হলে তাঁকে পালাতে হবে, সেই আসানসোলে; আজই রাত্রে, কাউকে কোনো খবর না দিয়ে।

একবার যখন তাঁর কর্তব্য স্থির হয়ে গেল, মনটাও বেশ হালকা বোধ হল। মন্দিরার সঙ্গেও তিনি বেশ সহজ ভাবেই কথা বলতে পারলেন।

বললেন, যখন বয়েস ছিল তখন রোজগার ছিল না তাই বিয়ে করি নি। যখন সামর্থ্য হল, তখন থেকেই তো বুকের এই ব্যামো। কাজেই দেখুন, বিয়ে আর হয় কি করে?

মন্দিরা হেসে বলেছিল, চলুন না, যে বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি একদিনেই আপনার বুকের দোষ সেরে যাবে। বিয়েও তখন করতে পারবেন।

তারপর গাড়ি যখন মন্দিরার এই বাড়িতে এসে পৌঁছল, মন্দিরা নিজে থেকেই বলেছিল, জানেন বোয়াল মশাই এ বাড়িটা আমারই নিজের। আগে বললে তো আসতেন না; তাই এতক্ষণ বলি নি। বাড়িটা একবার দেখুন, যদি পছন্দ না হয়, নেবেন না।

মন্দিরার এই ছলা কলার গুহ্যতম উদ্দেশ্যটি তক্ষুনি যেন বোয়াল মশাইর কাছে ব্যক্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর সংকল্প ছিল অটুট। তাই তিনি ঘাবড়ান নি এতটুকুও; বুকের ভেতরটাও আর ধুকপুক করে ওঠে নি। বরং তিনি বেশ একটু পুলকিত হয়েই উঠেছিলেন সেদিন।

তাই অনায়াসে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, না না তা কেন? বাড়ি যারই হোক, দেখতে কেন আসব না? আর পছন্দ হলে তা নেব বৈকি!

কিন্তু নিজের মনে মনে বার বার তখন বলেছিলেন, পছন্দ হলেও এ বাড়ি আর আমি নিচ্ছি না কিছুতেই। আপনি যে ভেবেছেন ফাঁদে ফেলে এখানে আমাকে নিয়ে আসবেন, আর রোজ আপনার

পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাবেন, সেটি আর হচ্ছে না। আজই আমি চলে যাচ্ছি, সেই আসানসোলে।

মন্দিরার এই মতলবটি পুরোপুরি ধরা পড়েছিল বলেই সেদিন তাঁর মজা লেগেছিল খুবই। গর্ব ভরে ভেবেছিলেন বোয়াল মশাই, তাঁকে ঠকানো অত সহজ নয়।

কিন্তু আজ এই আরাম কেদারায় শুয়ে, ঝিরঝিরে হাওয়ায়, পাখীর গানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বোয়াল মশাইর মনে হল, সেদিন ঝোঁকের মাথায় আসানসোল চলে গেলে সত্যি তিনি ঠকে যেতেন। এই স্বর্গসুখ হাত থেকে তাঁর ফস্কে যেত; ঐ মুহূর্তে।

ঐ তো পুকুরের জলে এক জোড়া হাঁস সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, গাছে গাছে পাখীর কাকলী শোনা যাচ্ছে। বোয়াল মশাইর মনে হল, এ পৃথিবীতে ওরা যেমন সুখী তিনিও ঠিক তেমনি সুখী।

এমনি সময় একটি মেয়ে বাড়ি থেকে একলাফে বাগানে নেবে ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে এল। এই মেয়েটিই রুবি; মন্দিরার মেয়ে।

মাত্র দিন দুই হল রুবি এসেছে, কিন্তু তাইতেই গোটা বাড়িটায় যেন সাড়া পড়ে গেছে। কারণে অকারণে ওর কলহাস্যে এবং গানে সারা বাড়িটা সর্বক্ষণ মুখরিত হয়ে আছে।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বোয়াল মশাই দেখলেন, রুবি তাঁর কাছেই এসেছে হাতে একখানা বই নিয়ে। তাঁর মনে হল, রুবির মুখখানা যেন একটু বিমর্ষ। কি ব্যাপার?

বোয়াল মশাই সোজা হয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে রুবি! মুখখানা অমন শুকনো যে? কি ব্যাপার?

রুবি বইখানা বোয়াল মশাইর হাতে দিয়ে বলল, ব্যাপার আর

কি? আমার মুখটাই অমনি। ও কিছু না। আচ্ছা, এই বইটাতে যা লিখেছে আপনি তা মানেন?

বই খানার নাম, আত্মহত্যা কি অপরাধ? রাঘব বোয়াল পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। মনস্তত্ত্ববিদ এক তরুণ অধ্যাপকের নতুন লেখা সাময়িক পত্রিকায় বেরোবার পর তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল দেখেই বোয়াল মশাই এটা ছাপিয়ে ছিলেন, নাম মাত্র রয়ালটি দিয়ে। অবশ্য তাতে তাঁর লাভই হয়েছে। ছ'মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়েছে।

সবাই ভাবে আগে পাণ্ডুলিপি না পড়ে বুঝি তিনি বই কখনও ছাপান না। তাই যদি হত তাহলে এখন তাঁর বুকের ব্যামো না হয়ে মাথার ব্যামো হত; এবং আজ এই আগড়পাড়ায় না এসে তাঁকে রাঁচী যেতে হত।

ময়রা যেমন তার দোকানের খাবার কখনও খায় না; বোয়াল মশাইও তাঁর প্রকাশিত বই কখনও পড়েন না। পাণ্ডুলিপিও দেখেন না।

তবু ভালো ভালো বই কি করে যে তাঁর হাতে আসে তাই ভেবে বোয়াল মশাই মনে মনে হাসলেন।

এই কথাটা সবাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। আর তিনিও একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, পড়াশুনা করতে হয়। খোঁজ খবর রাখতে হয়। তা না হলে পাব কি করে?

তিনি যে সত্যি কোন বই পড়েন না, এ কথাটা কেউ কিন্তু জানে না। তিনিও কাউকে তা বলেন না।

এখন এমন হয়েছে, সবাই জানে তিনি খুব বড় একজন পণ্ডিত। তাই সত্যি কথা বললেও কেউ তা বিশ্বাস করে না এখন। অবশ্য

তিনিও বড় একটা তা কখনও বলেন না। কারণ সব ব্যাবসা মানেই হল মিথ্যে কথা সত্যির মত করে বলা। তিনিও তাই করেন।

তাই রুবি যখন জিজ্ঞাসা করল, লেখক যা বলেছেন তা আপনি মানেন? তখন বোয়াল মশাই বইখানা হাতে নিয়ে রুবির দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মত মৃদু একটু হাস্য করলেন।

বললেন, লেখকের সব মত কি পাঠক কখনও মানে? এখানে অবশ্য লেখক আত্মহত্যার সপক্ষে খুব জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন।

এই পর্যন্ত বলে তাঁর খেয়াল হল, রুবির মত বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বইখানা একবার অন্তত পড়া দরকার ভালকরে। না হলে বিপদ হতে পারে। কাজেই তিনি কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, কিন্তু তোমার আজ কি হয়েছে বলতো? মুখখানা অমন শুকনো, হাতে এই রকম নীরস মর্বিড একখানা বই! কি ব্যাপার?

রুবি বলল, ব্যাপার খুবই গুরুতর। কলকাতা থেকে কে এক গড়গড়ি না ফড়গড়ি আসবে। মা বলেছে, স্টেশনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে আজই দুপুরে।

এইবার বোয়াল মশাই রুবির মন খারাপের কারণটি হঠাৎ ধরে ফেললেন। মনে মনে রুবির জন্য যে পাত্রটি মন্দিরা ঠিক করেছে, তারই নাম যুগল চরণ গড়গড়ি। ছেলেটি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর দেশের কাজে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। সন্ত্রাশক দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অভিযোগে অনেকদিন বেচারা কারারুদ্ধ থাকে। তাতে অবশ্য তার কোনো লোকসান হয় নি। বরং লাভই হয়েছে বলা চলে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক একটি দল থেকে

সে বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছে। এই ছেলেটির মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি আছে, যে মালমশলা অর্থাৎ পার্টস আছে তাতে মন্দিরার বিশ্বাস, একদিন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

বোয়াল মশাই নিজে কোনও দিন রাজনৈতিক কোনও দলে যোগ দেন নি। চিরদিন নিজেকে এই সব অনাবশ্যক উৎপাত থেকে তফাৎ রেখেছেন। গান্ধীজীর অহিংসাবাদকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন কিন্তু বিপ্লবী অর্থাৎ সন্ত্রাশকদের করেছেন ভয়। কিন্তু কোনও দলেই তিনি ভেড়েন নি।

কাজেই মন্দিরা যেদিন এই গড়গড়ির কথা, বিশেষ করে বিগত ওর বিপ্লবী জীবনের কথা ফলাও করে গল্প করেছিল, বোয়াল মশাই মুখে কিছু না বললেও মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন।

তাঁর মনে হয়েছিল, রুবির মত অমন স্মার্ট একটি মেয়ের পক্ষে, ঝরণার মত উচ্ছল ঐ যৌবনের পক্ষে এই সব রাজনৈতিক বিপ্লবীর সংস্পর্শ যত কম হয় ততই বোধহয় ভাল।

আজ রুবির কথা শুনে, ওর এই বিমর্ষ মুখখানা দেখে বোয়াল মশাইর মনটা রুবির প্রতি স্নেহ মায়া এবং সহানুভূতিতে হঠাৎ যেন গলে গেল। এই মেয়েটিকে তাঁর প্রথম থেকেই ভাল লেগেছে। মনে হয়েছে, আহা এমন একটি মেয়ে তাঁর নিজের যদি থাকত!

তাই তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন, যদি রুবির এই গড়গড়িকে ভাল না লাগে, পছন্দ না হয়, তবু যদি মন্দিরা ওর সঙ্গেই বিয়ে দিতে চায় রুবির মতের বিরুদ্ধে, তাহলে বোয়াল মশাই নিজে তাতে বাধা দেবেন।

বোয়াল মশাই জানেন এখনও মন্দিরা তাঁকে খুশি রাখতে চায়

তিনি অবশ্য এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন জায়গাটা খুবই ভালো লেগেছে বলেই তিনি এখানে থেকে গেছেন এবং মন্দিরার আসল উদ্দেশ্যটি এখনও কিছুই তিনি বোঝেন নি। আসলে মোটেই তা নয়। তিনি ঠিকই জানেন, আজ হোক কাল হোক মন্দিরা একদিন তার লেখার কথা বলবেই। তা জেনেও যে তিনি এখানে আছেন, তার কারণ হল মন্দিরা বললেই যে অমনি তিনি বই ছাপাতে রাজী হবেন এতবড় মূর্খ তিনি নন। জোর করে তাঁর ঘাড়ে বই চাপাতে আজও কেউ পারে নি, মন্দিরাও পারবে না। কাজেই সে ভয় তিনি করেন না। অবশ্য প্রথম দিন এই ভয়টাই তাঁর বেশী ছিল। তখন তাঁর শরীরও ছিল ক্লান্ত। পুকুরের ধারে এই ইজিচেয়ারে বসে সত্যি সেদিন তাঁর ক্লান্তি দূর হয়েছিল। তাই অচেনা অজানা হোটেলে দিন কাটানোর চেয়ে এখানে থাকাই ভালো মনে হয়েছিল।

তা ছাড়া সেদিন বাড়িতে তাঁকে একা রেখে মন্দিরা চলে গিয়েছিল কলকাতায়। তিনি ভেবে দেখেছিলেন, এইখানেই না হয় কাটালেন এই তিনটিদিন তারপর মন্দিরা যখন ফিরবে তখন না হয় চলে যাবেন আসানসোলে এখানে ভাল না লাগলে।

তার অবশ্য আর প্রয়োজন হয় নি। ভালোই লেগেছে তাঁর। আর সব চেয়ে ভাল লেগেছে এই রুবিকে। খুব ভালো এই মেয়েটি।

তাই রুবিকে খুশি রাখতে মন্দিরাকে বাধা দিতে মোটেই তিনি দ্বিধা করবেন না। তিনি জানেন, এখনও মন্দিরা তাঁর হাতে। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, মন্দিরার লেখা বাজে বইও পেশাদার লেখক দিয়ে সংস্কার করে তিনি বই ছাপিয়ে দিতে পারেন মন্দিরার নামে। সে বই হু হু করে কাটিয়ে দিতেও তিনি পারেন, বইএর চটকদার একটি নাম দিয়ে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে। শুধু "সেন্টিমেণ্টে

সুড়সুড়ি” এই নামটি দিয়েই যদি তিনি মন্দিরার বইটি আজ বাজারে ছাড়েন তাহলেই হুলুস্থুলু পড়ে যাবে এই কলকাতা শহরে। তিন মাসের মধ্যেই প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে সব কিছুই তিনি করবেন না যদি মন্দিরা রুবির ওপর চাপ দেয়।

কাজেই তিনি খুব ভরসা দিয়ে রুবিকে বললেন, তা এজন্য তুমি অত মন খারাপ করেছ কেন? এলই বা গড়গড়ি আজ দুপুরের গাড়িতে এখানে? ভয়টা তোমার কোথায়?

রুবি বলল, আপনি কিচ্ছু জানেন না। মার ইচ্ছে আমি যেন ওকে বিয়ে করি।

বোয়াল মশাই হেসে বললেন, তাতেই বা হয়েছেটা কি? ছেলেটা আসুক না এখানে। যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে আর বিয়ে করতে বাধা কি? যদি পছন্দ না হয় বিয়ে তুমি কোরো না।

রুবি বলল, মাকে তো আপনি জানেন না তাই এসব বলছেন। একবার যখন মা ঠিক করেছে তখন পছন্দ আমাকে করতেই হবে নইলে মা ছাড়বে না। তাইত আমার এত খারাপ লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি কিংবা বিষটিষ কিছু খাই এক্ষুনি।

বোয়াল মশাই রুবিকে কাছে টেনে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কিচ্ছু তোমার ভাবনা নেই মা। যাকে তোমার ভালো লাগে তাকেই তুমি বিয়ে কোরো।

এমনি সময় বাড়ির বারান্দা থেকে মন্দিরার ডাক শোনা গেল, রুবি! রুবি!

চমকে উঠে রুবি বলল, ঐ দেখুন মা ডাকছে। আমি যাই।

বোয়াল মশাই ভরসা দিয়ে বললেন, যাও মা তোমার কোনো

তিনি অবশ্য এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন জায়গাটা খুবই ভালো লেগেছে বলেই তিনি এখানে থেকে গেছেন এবং মন্দিরার আসল উদ্দেশ্যটি এখনও কিছুই তিনি বোঝেন নি। আসলে মোটেই তা নয়। তিনি ঠিকই জানেন, আজ হোক কাল হোক মন্দিরা একদিন তার লেখার কথা বলবেই। তা জেনেও যে তিনি এখানে আছেন, তার কারণ হল মন্দিরা বললেই যে অমনি তিনি বই ছাপাতে রাজী হবেন এতবড় মূর্খ তিনি নন। জোর করে তাঁর ঘাড়ে বই চাপাতে আজও কেউ পারে নি, মন্দিরাও পারবে না। কাজেই সে ভয় তিনি করেন না। অবশ্য প্রথম দিন এই ভয়টাই তাঁর বেশী ছিল। তখন তাঁর শরীরও ছিল ক্লান্ত। পুকুরের ধারে এই ইজিচেয়ারে বসে সত্যি সেদিন তাঁর ক্লান্তি দূর হয়েছিল। তাই অচেনা অজানা হোটেলে দিন কাটানোর চেয়ে এখানে থাকাই ভালো মনে হয়েছিল।

তা ছাড়া সেদিন বাড়িতে তাঁকে একা রেখে মন্দিরা চলে গিয়েছিল কলকাতায়। তিনি ভেবে দেখেছিলেন, এইখানেই না হয় কাটালেন এই তিনটিদিন তারপর মন্দিরা যখন ফিরবে তখন না হয় চলে যাবেন আসানসোলে এখানে ভাল না লাগলে।

তার অবশ্য আর প্রয়োজন হয় নি। ভালোই লেগেছে তাঁর। আর সব চেয়ে ভাল লেগেছে এই রুবিকে। খুব ভালো এই মেয়েটি।

তাই রুবিকে খুশি রাখতে মন্দিরাকে বাধা দিতে মোটেই তিনি দ্বিধা করবেন না। তিনি জানেন, এখনও মন্দিরা তাঁর হাতে। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, মন্দিরার লেখা বাজে বইও পেশাদার লেখক দিয়ে সংস্কার করে তিনি বই ছাপিয়ে দিতে পারেন মন্দিরার নামে। সে বই হু হু করে কাটিয়ে দিতেও তিনি পারেন, বইএর চটকদার একটি নাম দিয়ে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে। শুধু "সেন্টিমেন্টে

সুড়সুড়ি" এই নামটি দিয়েই যদি তিনি মন্দিরার বইটি আজ বাজারে ছাড়েন তাহলেই হুলুস্থুলু পড়ে যাবে এই কলকাতা শহরে। তিন মাসের মধ্যেই প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে সব কিছুই তিনি করবেন না যদি মন্দিরা রুবির ওপর চাপ দেয়।

কাজেই তিনি খুব ভরসা দিয়ে রুবিকে বললেন, তা এজন্য তুমি অত মন খারাপ করেছ কেন? এলই বা গড়গড়ি আজ দুপুরের গাড়িতে এখানে? ভয়টা তোমার কোথায়?

রুবি বলল, আপনি কিচ্ছু জানেন না। মার ইচ্ছে আমি যেন ওকে বিয়ে করি।

বোয়াল মশাই হেসে বললেন, তাতেই বা হয়েছেটা কি? ছেলেটা আসুক না এখানে। যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে আর বিয়ে করতে বাধা কি? যদি পছন্দ না হয় বিয়ে তুমি কোরো না।

রুবি বলল, মাকে তো আপনি জানেন না তাই এসব বলছেন। একবার যখন মা ঠিক করেছে তখন পছন্দ আমাকে করতেই হবে নইলে মা ছাড়বে না। তাইত আমার এত খারাপ লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি কিংবা বিষটিষ কিছু খাই এক্ষুনি।

বোয়াল মশাই রুবিকে কাছে টেনে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কিচ্ছু তোমার ভাবনা নেই মা। যাকে তোমার ভালো লাগে তাকেই তুমি বিয়ে কোরো।

এমনি সময় বাড়ির বারান্দা থেকে মন্দিরার ডাক শোনা গেল, রুবি। রুবি!

চমকে উঠে রুবি বলল, ঐ দেখুন মা ডাকছে। আমি যাই।

বোয়াল মশাই ভরসা দিয়ে বললেন, যাও মা তোমার কোনো

ভয় নেই। যতক্ষণ আমি এখানে আছি বিয়ে তোমার হবে না, তুমি যদি না চাও।

ভরসা পেয়ে রুবি খুশি হয়ে চেঁচিয়ে বলল, যাই মা।

এই বলে ছুটে বাগান দিয়ে চলে গেল।

বোয়াল মশাই আরাম কেদারায় বসে রুবির ঐ যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল, রুবি যেন নাচতে নাচতে চলে গেল।

রুবির মন থেকে উদ্বেগের মেঘটা যে তিনি আজ কাটিয়ে দিতে পেরেছেন তাইতেই তাঁর খুব আনন্দ হল। ভাবলেন, আজকের সকালটা সত্যি খুবই মধুর।

ঐটুকু মেয়ে কিনা আজ আত্মহত্যার বই পড়ছে। ভাগ্যিস বইখানা এখনও তাঁরই হাতে। সহজে আর এখানা তিনি হাতছাড়া করবেন না। নিজে আগে একবার এটা পড়ে দেখবেন। তারপর লুকিয়ে ফেলবেন। এই ভেবে বোয়াল মশাই প্রফুল্ল মনে বইখানা খুলে বসলেন।

॥ চার ॥

যুগল চরণ গড়গড়ি ট্যাকসি থেকে শিয়ালদা স্টেশনে নাবলো। সঙ্গে একটি সুটকেস এবং হোল্ডঅল। কুলির মাথায় এই মোট চাপিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট ঘরে এসে একখানা আগড় পাড়ার টিকেট কেটে গাড়িতে চেপে বসল।

যুগল চরণ সাধারণতঃ থার্ড ক্লাসেরই খদ্দের। কিন্তু আজকে যাচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসে। আজকাল প্রায়ই তাকে ফার্স্ট ক্লাসেই চড়তে হয়। যদিও তার এখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স তবু রাজনৈতিক মহলে তার বেশ নাম হয়েছে। দলের মধ্যে বেশ একটু প্রতিপত্তিও হয়েছে। সেই কারণে সাহিত্য-সভা অথবা অন্য কোন জলসায় সভাপতি কিংবা প্রধান অতিথির জন্যে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রীদের যখন আর পাওয়া যায়না তখন এই যুগল চরণেরই ডাক পড়ে, কলকাতায় এবং মফঃস্বলে। তখন যুগলচরণ ট্যাকসির বদলে প্রাইভেট গাড়িতে যায়, এবং ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া চড়ে না। আজ কিন্তু সে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে নিজের খরচায়। নিজের গরজে।

কিছুদিন আগে নাচগানের এক জলসায় যুগল চরণ ছিল সভাপতি। একটি মেয়ের উর্বশী নৃত্য দেখে ওর বুকের ভেতরটা সেদিন হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠেছিল। আজ যুগল চরণ সেই মেয়েরই বাড়িতে যাচ্ছে, তারই মায়ের বিশেষ একটি নিমন্ত্রণে।

কাজেই সে গাড়িতে বসে ভাবছে, এ সংসারে অসম্ভব বলে সত্যি কোন বস্তু নেই। নেপোলিঅন যা বলেছিলেন তা যে এত বেশী সত্যি আগে কখন ও যুগল চরণ বোঝে নি।

নইলে অমন আধুনিকা শিক্ষিতা এবং নাচগান জানা সুন্দরী একটি তরুণীর সাহচর্য পাবার জন্য সে এমন একটি আমন্ত্রণ পেল কি করে? তাও আবার ঐ তরুণীর মার কাছ থেকে?

সেদিনকার জলসায় যুগল চরণ সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে অভ্যাস মত সকলের প্রশংসা করে রুবির নাচেরই প্রশংসা করেছিল সবচেয়ে বেশী। তারই ফলে ওর ভাগ্য খুলে গেল। রুবির মা মন্দিরা নিজে ওর বাড়িতে এসে একদিন দেখা করলেন। ছুটিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার আমন্ত্রণ করলেন।

যুগল চরণ অবশ্য এক কথাতেই রাজী হয়ে যায় নি। বেশ কয়েকদিন মন্দিরাকে ঘুরিয়েছে নিজের দর বাড়াবার জন্য। তারপর একদিন রাজী হয়েছে।

যুগল চরণের রাজী হওয়ার কারণ ছিল দুটি। আসল উদ্দেশ্য যদিও রুবির মত আধুনিকা একটি তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া কিন্তু সেটা গোপন অর্থাৎ গৌণ। প্রকাশ্য কারণটি হল, মন্দিরা বলেছে ওর বাড়িতে নতুন একটা টিউব ওয়েল আর ইলেকট্রিক পাম্প বসিয়ে সারা বাড়িটায় জল সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করবে। যুগল চরণ এই সব ছোট খাট কাজও হাতছাড়া করে না আজকাল। কারণ ও দেখেছে এতেও বেশ দু পয়সা আসে; অথচ কোন ঝঞ্ঝাট নেই। নিজের খাটুনি নেই কিচ্ছু। টাকাও ঢালতে হয় না। এই অর্ডারটি চেনা কোনো কনট্রাক্টরের কাছে শুধু একবার জানিয়ে দিলেই চলে। তাই আগড় পাড়ায় আসার এইটেই তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গাড়ি যেই আগড় পাড়ায় এল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যুগল চরণ দেখল, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে রুবি একা। লাল রঙএর জাপানী একটি ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

রুবি নিজে আসবে স্টেশনে তাও আবার একা এতটা যুগল চরণ আশা করে নি কক্ষনো। মন্দিরা আধুনিকা মহিলা; তাই বলে এত বড় মেয়েকে একা স্টেশনে পাঠাবে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে তাকি কখনও ভাবা যায়? আনন্দে বিস্ময়ে যুগল চরণের মনটা আজ নেচে উঠল ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা রুবির অপূর্ব ঐ ভঙ্গিটি দেখে।

ফার্স্ট ক্লাশের কামরা থেকে গলা বার করে যুগল চরণ রুবিকে আজ প্রাণ ভরে দেখল। হাসি মুখে তাকিয়ে রইল রুবির দিকে।

যুগল চরণের কামরা রুবির সামনে দিয়ে এগিয়ে চলল জানালা দিয়ে গলা বার করা যুগল চরণকে নিয়ে, তবু রুবি নড়ল না। ফিরে একবার চাইল পর্যন্ত উৎসুক ঐ গড়গড়ির দিকে।

কলেজের সেই জলসায় রুবি একবারটি শুধু দেখেছে সভাপতির আসনে ফুলের মালা গলায় খদ্দর পরা এই গড়গড়িকে। সেই লোকটিই যে আজ কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে এমনি করে তাকিয়ে আছে অসভ্যের মত রুবি তা বুঝল না।

আজ এমনিতেই রুবির মন মেজাজ ভাল নেই। স্টেশনে এসেছে দায়ে পড়ে, মার বকুনি খেয়ে। কাজেই সে ছাতাটি খুলে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে, বিরক্ত গম্ভীর মুখে। ট্রেন থামল, কিন্তু পরিচিত কাউকেই আজ রুবি দেখতে পেলনা।

এমনি সময় যুগল চরণ এসে রুবির সামনে দাঁড়াল, মুটের মাথায় স্যুটকেস আর হোলডঅলটি নিয়ে।

হাত দুটি জোড় করে এক গাল হেসে গড়গড়ি বলল, নমস্কার! আপনিই তো মিস চৌধুরী?

রুবি ভ্রূ কুঁচকে চমকে ফিরে তাকাল। দেখল, খদ্দরের পোশাক পরা কালো কুৎসিত চেহারার সেই লোকটাই দাঁত বার করে হাসছে। সারা মুখে ব্রণের দাগ। দেখেই রুবির পিত্তি জ্বলে গেল।

যুগল চরণ রুবির ঐ কুঞ্চিত ভ্রূ দেখে মোটেই কিন্তু ঘাবড়াল না। তেমনি হেসে বলল, আমারই নাম যুগল চরণ গড়গড়ি।

কাজেই রুবিকেও এখন হাসতে হল। বলতে হল, ও আপনি? আপনাকে নিতেই আমি এসেছি। কাছেই আমাদের বাসা। চলুন।

রুবির মুখে এই হাসি দেখে মনে মনে মোহিত হল যুগল চরণ।

বলল, আমি কিন্তু আপনাকে একবার দেখেই চিনেছি। আপনার সেই উর্বশী নৃত্য সত্যি অতি অপূর্ব। একবার যে দেখেছে জীবনে কখনও সে তা ভুলবে না। আপনার নাচ দেখে এই প্রথম আমি বুঝলাম কেন সেকালের ঋষিরা পর্যন্ত তপস্যা ভুলে যেতেন অপ্সরাদের নৃত্য দেখে।

রুবির কিন্তু এই মন্তব্য মোটেই কিছু ভাল লাগল না। বরং মনে হল, লোকটা অতি অসভ্য এবং বর্বর অর্থাৎ ভালগার। কিন্তু মন্দিরা বলেছে, এই লোকটাকেই বিয়ে করতে হবে। কাজেই মনে মনে রুবি এখন ভীষণ চটে গেল অসভ্য এই গড়গড়ির ওপর। এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রুবি এগিয়ে চলল।

ততক্ষণে ওরা স্টেশনের বাইরে এসে গেছে। বোয়াল মশাইর গাড়ি নিয়েই রুবি এসেছিল স্টেশনে। তাড়াতাড়ি রুবি এখন সেইদিকেই এগিয়ে গেল।

ড্রাইভার মাল পত্র সব ক্যারিয়ারে তুলে নিল। যুগল চরণ

এগিয়ে এসে পেছনের দরজা খুলে রুবির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, উঠে পড়ুন।

রুবির ইচ্ছে ছিল সামনে বসবে ড্রাইভারের পাশে। কিন্তু মন্দিরা দেখলে যদি চটে যায় সেই ভয়ে অগত্যা সে গাড়িতে গিয়ে বসল গড়গড়ির পাশে জানালার কাছ ঘেঁষে।

যুগল চরণ রুবির পাশে বসে গাড়িতে চড়ে যাচ্ছে সেই আনন্দেই বিভোর হয়ে আছে। রুবির সঙ্কোচ তার নজরে পড়ল না।

পকেট থেকে স্টেট এক্স প্রেসের চ্যাপটা একটা বাক্স খুলে তাই থেকে একটি বিড়ি তুলে দাঁত দিয়ে সে চেপে ধরল নিজের মনের আনন্দে।

তাই দেখে আবার রুবির ভ্রূ দুটি কুঁচকে গেল বিরক্তিতে। জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নাকে ছোট্ট একটি রুমাল চেপে বসল রুবি এই গন্ধ থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে। বেচারা রুবি! বিড়ির গন্ধ ও সইতে পারে না কিছুতেই। কেমন যেন উল্টে আসে সব পেটের ভেতর থেকে।

॥ পাঁচ ॥

সকাল থেকেই মন্দিরার মনে আজ খুব ফুর্তি। সব কাজই ঠিক ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে তার নিজের পরিকল্পনা মত। বোয়াল মশাই এসেছেন এবং খুশি হয়ে রয়েছেন মন্দিরারই বাড়িতে।

ভদ্রলোক প্রথম প্রথম মন্দিরার দিকে সোজা তাকিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারতেন না। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকাতেন। দেখে মন্দিরার হাসি পেত। ইচ্ছে হত ঠাট্টা করে আরও বেশী বিব্রত করে তুলতে। কিন্তু মন্দিরা বুঝেছিল, এখনও সে সময় আসে নি। এখনও বোয়াল মশাই এই নতুন পরিবেশে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারেন নি। এখনও তাঁর মনে ভয় আছে, দ্বিধা আছে।

কাজেই মন্দিরা সূতো ছেড়ে দিয়েছে, আর দেখেছে বোয়াল মশাই কি করেন।

তাইতেই কিন্তু কাজ হয়েছে অদ্ভুত। তিন দিনের মধ্যেই বোয়াল মশাই শান্ত হয়ে গেছেন বেশ অনেকখানি।

বোয়াল মশাইর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা পুকুরের ধারে গদি আঁটা ঐ ইজি চেয়ারটা। ঐ খানেই তিনি বসে থাকতে ভালবাসেন হাতে একখানা বই নিয়ে। কিন্তু বইখানা তাঁর কোলের ওপরই পড়ে থাকে বেশীর ভাগ সময়। চুপকরে বসে কি যেন তিনি ভাবেন আর তাই তাঁর ভাল লাগে বই পড়ার চেয়ে।

মন্দিরা দেখেছে দূর থেকে তাঁকে দেখলেই বোয়াল মশাই বইখানা তুলে মুখের সামনে আড়াল করে ধরেন।

কাজেই মন্দিরা বুঝেছে এখনও বোয়াল মশাই তাকে ভয় করেন ; এড়িয়ে থাকতে চান।

সেই সুযোগও দিয়েছে তাঁকে মন্দিরা। আর তাইতেই খুব সুফল হয়েছে। বোয়াল মশাই এখনও এ বাড়িতে টিকে আছেন।

ভদ্রলোকের ভয়টি যে কোথায় তাও ধরে ফেলেছে মন্দিরা সেই প্রথম দিনে, যেদিন বোয়াল মশাই এখানে আসেন বাড়ি দেখতে।

গাড়িতে বসেই টের পেয়েছিল মন্দিরা বোয়াল মশাই দারুণ এক অস্বস্তি বোধ করেছেন তার পাশে বসে। সেদিনকার ঐ উগ্র পোশাক বোয়াল মশাই সইতে পারেন নি। কাজেই বাড়িতে ঢুকেই মন্দিরা বলেছিল, আপনি একটু বসুন বোয়াল মশাই। এক্ষুনি আমি আসছি।

এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক বদলে এসেছিল। ঠিক সেই শাদা পোশাক যা দেখে বোয়াল মশাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সেই প্রথম দিনে তাঁর নিজের আপিসে।

ইতিমধ্যে চাকর এসে বোয়াল মশাইকে ঠাণ্ডা সরবত দিতে চেয়েছে, বোয়াল মশাই তা নেন নি। তাই শুনে মন্দিরা যখন বলেছে, তা হলে ডাবের জল খান অন্তত একগ্লাস !

বোয়াল মশাই তখন আর না বলেন নি। বরং দেখা গেছে এ জল খেয়ে তিনি তৃপ্তি বোধ করেছিলেন খুবই।

তারপর মন্দিরা যখন বাড়িটা দেখিয়ে বাগানে নেবে এই পুকুরটার ধারে এল, বোয়াল মশাই যে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন এমন একটি নিরিবিলি জায়গা দেখে তাও মন্দিরা বুঝেছিল।

গাছের তলায় ঐ আরাম কেদারায় বসে সেদিন বোয়াল মশাই যে আরামের একটি হাঁফ ছেড়েছিলেন তাও মন্দিরা লক্ষ্য করেছে সেদিন।

পাশের টুলটিতে বসে মন্দিরা তখন বলেছিল, এই আমার বাড়ি। বলুন এখন পছন্দ হল কিনা।

বোয়াল মশাই তখন বলেছিলেন, বাড়িটি আপনার খুবই ভালো এবং নিরিবিলি কিন্তু—

মন্দিরা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বেশ তো আপনি এইখানেই বসুন একটু। মন স্থির করুন। আমি ওদিকটা দেখে আসি একবার।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে মন্দিরা সেদিন দেখেছিল, বোয়াল মশাই আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন লম্বা হয়ে, চোখ দুটি বন্ধ করে। কিন্তু তাঁর নাক তখন ডাকছে।

তাই দেখে সেদিন মন্দিরা হেসে উঠেছিল খিল খিল করে। সেই শব্দে বোয়াল মশাইও জেগে উঠেছিলেন অপ্রস্তুত হয়ে।

মন্দিরা আবার সেই টুলে বসে জিজ্ঞাসা করেছিল, এইবার বলুন দেখি জায়গাটা কেমন? পছন্দ হয়? না কি অন্য কোন হোটেলে গিয়ে উঠবেন?

এই কথায় খুবই লজ্জা পেয়েছিলেন সেদিন বোয়াল মশাই। লজ্জিত হয়ে হেসে তিনি বলেছিলেন, না না কি যে বলেন!

মন্দিরা তখন বলেছিল, আপনি আজ থেকেই থাকুন তাহলে এখানে। আপনার জিনিস পত্র ড্রাইভারকে দিয়ে আনিয়ে নিন। আমিও এ সঙ্গে চলে যাই কলকাতায় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে।

তখনই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন বোয়াল মশাই, সেকি?

আপনার নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে হোটেলে থাকবেন কেন ?

তখনই মন্দিরা বলেছিল রুবির কথা। তার জন্য একটি পাত্র খোঁজার কথা। যুগল চরণ গড়গড়িকে যে মনে মনে মন্দিরা রুবির জন্য উপযুক্ত একটি পাত্র বলে ভেবেছে তা'ও সেদিন বলেছিল।

তারপর বলেছিল, এইজন্যই আমার ২।৩ দিন এখন কলকাতা থাকা দরকার। আর এইসব কাজের জন্য গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলই দেখুন সব চেয়ে সুবিধে।

তখন'ও মন্দিরা বলে নি যে যুগল চরণকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যই তার কলকাতা যাওয়া দরকার। কারণ মন্দিরা বুঝেছিল, বোয়াল মশাই এখন একটু নিরিবিলি থাকতে চান। সেই জন্যই দিনকয়েকের জন্য তাঁকে একা থাকবার সুযোগ দেওয়া মন্দিরার ভাল মনে হয়েছিল।

তাতে কাজ'ও হয়েছে মন্দিরার হিসেব মত। বোয়াল মশাই এইখানেই থেকে গেছেন, সেইদিন থেকে।

মন্দিরা যখন ফিরে এল তিন দিন পর, সেদিনও বোয়াল মশাই বসেছিলেন ঐ পুকুরের ধারে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে। মন্দিরাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এক গাল হেসে।

মন্দিরা বুঝেছিল বোয়াল মশাই এই তিনদিনেই শান্ত হয়েছেন অনেকখানি। এমন কি সহজভাবে হেসে কথা পর্যন্ত বলতে পেরেছেন চোখে চোখ রেখে।

মন্দিরা জিজ্ঞাসা করেছিল, বলুন বোয়াল মশাই কেমন কাটল এ ক'দিন। হোটেলের চেয়ে খারাপ ?

আবার বোয়াল মশাই লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। হাত জোড়

করে মাটির দিকে তাকিয়ে বিনীত লজ্জিত কণ্ঠে বলেছিলেন, আবার ওকথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন ?

মন্দিরা তখন বলেছিল, বলুন আপনার শরীর এখন কেমন ? বুকের সেই ঢিব ঢিবিটা কমেছে ?

বোয়াল মশাই তখন চোখ তুলে মন্দিরার দিকে তাকিয়েছিলেন সেই বিনম্র লজ্জিত মুখে। হেসে বলেছিলেন, খুব ভাল আছি আমি। অসুখ তো সেরেই গেছে মনে হচ্ছে।

বিলোল কটাক্ষ হেনে মন্দিরা তখন বলেছিল, তিনদিনেই সেরে গেল ? তাহলে এখন থেকেই একটি পাত্রী দেখতে শুরু করি কি বলেন ?

বোয়াল মশাই হেসেছিলেন আবার চোখটি নত করে তেমনি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

সেদিন আর কথা না বাড়িয়ে উঠে এসেছিল মন্দিরা। বোয়াল মশাই আবার আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

তারপর থেকে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এসেছেন বোয়াল মশাই, বিশেষকরে রুবি এ বাড়িতে আসার পর থেকে।

তাই দেখে গড়গড়ির কথাটাও তুলেছিল মন্দিরা বোয়াল মশাইর কাছে। বলেছিল, ছেলেটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যই তাকে এখানে আসতে বলেছে মন্দিরা।

গড়গড়ির পরিচয় শুনে একই বাড়িতে তার সঙ্গে থাকতে হবে জেনে বোয়াল মশাই প্রথমে একটু যেন চমকে উঠেছিলেন। বিব্রতও বোধকরেছিলেন বেশ। মুখে চোখে আবার সেই সন্দেহ এবং উদ্বেগের ভাবটি ফুটে উঠেছিল তাঁর। কিন্তু যেই মন্দিরা রুবির কথা তুলল, পাড়ার সেই বেকার অলীক ছোঁড়াটার সঙ্গে রুবির

মেলামেশার কথা তুলে বোয়াল মশাইর কাছে পরামর্শ চাইল তখনি আবার তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। বললেন, বেশ তো, আসুক না গড়গড়ি। রুবির যদি পছন্দ হয় দিয়ে দিন ওরই সঙ্গে বিয়ে।

কাজেই মন্দিরার বোয়াল মশাইকে নিয়ে আর ভাবনা নেই। এখন শুধু ভাবনা রুবিকে নিয়ে। তাও মন্দিরা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গড়গড়িকে আসতে বলেছে আজই। আর রুবিকে পাঠিয়েছে স্টেশনে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে।

তাই নিজের পরিকল্পনা মত সব কাজ এগিয়ে যাচ্ছে দেখে মন্দিরা খুব খুশি। রুবিকে স্টেশনে পাঠিয়ে নিজে ফিটফাট হয়ে বসে আছে বেতের একটা চেয়ারে, বাড়ির বারান্দায়।

এইখানে বসেই রেললাইন দেখা যায়। কলকাতার গাড়ি এল, বারান্দায় বসেই মন্দিরা তা দেখতে পেল।

মিনিট পনের পরেই বোয়াল মশাইর গাড়ি গেটে ঢুকল, রুবি আর গড়গড়িকে নিয়ে।

গাড়ির এক দরজা খুলে নাবল রুবি। আর এক দরজা দিয়ে গড়গড়ি।

॥ ছয় ॥

গড়গড়িকে মন্দিরার সামনে হাজির করেই রুবি বেরিয়ে যাবার ফুন্দি করেছিল; কিন্তু মন্দিরা তা দিল না। প্রথমে আটকে রাখল, গড়গড়ির সঙ্গে কথা বলার জন্য। তারপর বলল, আজই তাকে সিনেমায় যেতে হবে গড়গড়িকে নিয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটার শোতে; বাজারের কাছে মাতঙ্গী সিনেমায়।

তাই রুবি মুখখানা কালো করে বাজারের দিকে বেরোল আজকের সন্ধ্যার শোতে দুখানা টিকিট কাটতে। একে তো আগে থেকেই রুবি গড়গড়ির ওপর বিরূপ হয়ে ছিল; আজকে আরও বিগড়ে গেছে গড়গড়ির ঐ চেহারা দেখে আর অভদ্র ওর কথা শুনে।

যেমন লোকটার চেহারা তেমনি তার কথাবার্তা। তার ওপর আবার বিড়ি খায়। অথচ এই লোকটারই সঙ্গে তাকে আজ সিনেমায় যেতে হবে। বসে থাকতে হবে ঠায় দুটি ঘণ্টা পাশাপাশি।

তাই রুবি ভাবতে ভাবতে চলেছে, নিজের মনের সংকোচ নিয়ে। এমনি সময় পেছন থেকে সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠল টুংটুং করে।

এই ঘণ্টা রুবির চেনা। আগে প্রায়ই এ ঘণ্টা বাজত রুবিদের

বাড়ির গেটে এমনি টুংটুং শব্দ করে, আর রুবি ছুটে এসে গেট খুলে দিত। হাসতে হাসতে বলত, আজকে এত দেরী যে?

গেট দিয়ে ঢুকে এক পাশে সাইকেলটি রেখে তখন অলীককুমার রুবির সঙ্গে বাড়ির বারান্দায় এসে বসত ক্যারম খেলতে। ক্যারম খেলা শেষ হলে দুজনে বেড়াতে বেরোত রেললাইন ধরে। না হয় বাড়িতে বসেই হাসি গল্প গান করত। কিন্তু মন্দিরার তা পছন্দ হল না। ফলে অলীকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করা রুবির বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই এখন দেখা করতে হয় গোপনে, মন্দিরাকে লুকিয়ে। সন্দেহের কোন সুযোগ না রেখে।

সাইকেলের পরিচিত সেই ঘণ্টা শুনে রুবি আজ ঘুরে দাঁড়াল রাস্তার ধারে, মুখখানা তেমনি কালো করে।

এক গাল হেসে সাইকেল থেকে নেবে রুবির শুকনো ঐ গম্ভীর মুখ দেখে অলীককুমার হকচকিয়ে গেল।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে রুবি? এত গম্ভীর যে? কোথায় চলেছ এই দুপুরে?

রুবি বলল, যাচ্ছি মাতঙ্গী সিনেমায়, টিকেট কাটতে।

আশ্চর্য হয়ে অলীক বলল, মুখটা তাহলে অত গম্ভীর কেন? আমি ভাবলাম, মাসিমার বুঝি কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে আর তুমি ছুটেছ ডাক্তারের কাছে।

রুবি বলল, অসুখ তো আমার নিজের। জান, কার জন্য এই টিকেট কাটতে যাচ্ছি?

অত্যন্ত সহজ গলায় হেসে অলীক বলল, জানি বৈ কি। নিশ্চয়ই আমার জন্য।

ব্যঙ্গভরে ঠোঁট উল্টে রুবি বলল, ভারী বয়ে গেছে আমার

তোমার জন্য টিকেট কাটতে। দুখানা টিকেট কাটব একখানা আমার আর অন্যটা আর একজনের। আজ বিকেলের শোতে।

বিস্মিত হয়ে অলীক বলল, সে কি? আজ বিকেলে না আমাদের পূজা-জলসায় নাচের রিহার্সেলে তোমার যাবার কথা?

হাঁটতে হাঁটতে রুবি বলল, সে সব এখন বন্ধ। আপাতত এই মার হুকুম। আজ বিকেলে সিনেমায় যেতে হবে যুগল চরণ গড়গড়িকে নিয়ে।

অলীক যেন আকাশ থেকে পড়ল। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে হাঁ করে রুবির দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বলল, বল কি? যুগলবাবুকে তোমরা পেলে কোথায়? কয়েকদিন আগে আমরাই তো গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ি, আমাদের এই পূজা-জলসায় সভাপতি হবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বললেন, এবার পূজায় তাঁর নাকি অনেক বেশি কাজ। সময় হবে না।

তেমনি হেসে রুবি বলল, আপাতত তাঁর সেই অনেক বেশি কাজ আমাদেরই বাড়িতে এবং তাঁকে নিয়েই আমি যাচ্ছি সিনেমায়, আজই বিকেলে।

অলীক বলল, বেশ তাহলে আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে। তুমি আলাপ করিয়ে দিও ভদ্রলোকের সঙ্গে। তার পর ক'দিন উনি এখানে আছেন শুনে আমাদের জলসার কথাটা বলব এখন।

রুবি এইবার হেসে ফেলল।

বলল, তোমার যেমন বুদ্ধি! তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আর উনি গিয়ে বাড়িতে মার কাছে সব বলে দিন। তখন?

অলীক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তাইত! তাহলে? জলসার জন্য তাহলে কি করে ওঁকে ধরা যায়?

বিরক্ত হয়ে রুবি বলল, তুমি তো খালি জলসার কথাই ভাবছ। এদিকে আমার অবস্থা কি হয়েছে তার কিছু খোঁজ রাখ?

উদ্বিগ্ন হয়ে অলীক বলল, কেন? কি হয়েছে?

রুবি বলল, বলতে পার কেন মা ঐ গড়গড়িকে এখানে নিয়ে এসেছে, আর আমাকে পাঠিয়েছে তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে, আবার এখন বলছে সিনেমা দেখাতে?

রুবির কথার ধাঁচটা একটু বাঁকা। তাই অলীক একটু থতমত খেয়ে গেল।

বলল, কেন? তাতে কি হয়েছে? যুগলবাবু মানী-লোক, বিধানসভার সভ্য। তাঁকে একটু বেশিরকম খাতির না করলে চলবে কেন?

আবার রুবি হেসে উঠল ঠাট্টা করে। হাসতে হাসতে বলল, তাই মার ইচ্ছে আমি যেন ওকে আরও একটু খাতির করে একেবারে বিয়ে করে ফেলি। বুঝলে?

দুইজনে রাস্তা দিয়ে সিনেমার দিকেই যাচ্ছিল কথা বলতে বলতে।

এই কথা শুনে অলীক দাঁড়িয়ে গেল সাইকেলহাতে। আশ্চর্য হয়ে বলল, বল কি? ওর তো অন্তত তোমার ডবল বয়েস?

রুবি বলল, তাতে কি হয়েছে? লোকটা তো মানী, তার ওপর বিধান সভার সভ্য।

অলীক বলল, হোক সে মানী। কিন্তু লোকটা মোটেই ভাল নয়। কুৎসিত চেহারা।

হেসে রুবি বলল, তাতেও কিছু এসে যায় না। মার ওকে খুব পছন্দ।

অধীর হয়ে অলীক বলল, না না রুবি ওকে তুমি বিয়ে করো না কক্ষনো। তুমি যদি রাজী না হও জোর করে কেউ তোমায় আর বিয়ে দেবে না। কি বল?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে বাঁকা হাসি হেসে রুবি বলল, যদি দেয়? পারবে তুমি আটকাতে?

বাধা দিয়ে অলীক বলল, না না মোটেই এ সব ঠাট্টার কথা নয়। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। তোমরা ওকে জান না তাই ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছ। লোকটার নামে অনেক বদনাম আছে। মাসিমা যদি জানতেন, কখনো ওকে ঢুকতে দিতেন না বাড়িতে।

তেমনি পরিহাসের সুরে রুবি বলল, বেশ তো যেও না তুমি একবার তোমার ঐ মাসিমার কাছে এই ভুল ভেঙে দিয়ে আসতে।

অলীক বলল, তুমি জান তোমার মার কাছে যাবার আমার উপায় নেই তবু শুধু ঠাট্টা করছ। আমি বলছি, সত্যি এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়।

এই বলে সাইকেলের সিটের ওপর অলীক একটা ঘুষি মারল।

তাই দেখে রুবি আবার হেসে উঠল, খিল খিল করে।

বলল, মাকে তো জান, একবার যা ঠিক করে সহজে আর তা নড়চড় হয় না। একবার কারো ওপর চটে গেলে সহজে সে রাগ আর যায় না।

সে কথা কি আর অলীক জানে না? খুব ভাল করেই তা জানে। আর তা জানে বলেই তো গড়গড়ির ব্যাপারটা নিয়ে মন্দিরার কাছে যেতে পারে না।

তাই রুবির এই কথা শুনে অলীক বলে উঠল, তুমি একটা কাজ কর রুবি। গড়গড়িকে নিয়ে এমন কিছু কর যাতে তোমার মা খুব চটে যান ঐ গড়গড়ির ওপর।

আবার রুবি হেসে উঠল খিল খিল করে।

বলল, ঢের হয়েছে। তোমাকে আর বুদ্ধি দিতে হবে না। এইবার আমি যা বলি তাই কর দেখি। পাঁচসিকে পয়সা বার কর। একসঙ্গে তিনখানা টিকেট কিনি পাশাপাশি। তোমার সিটের পাশেই আমি বসব। কিন্তু আমাকে দেখেই দাঁত বার করে আবার হেসে ফেল না যেন। মনে রাখবে আমরা কাউকে কেউ চিনি না। পারবে?

অবাক বিস্ময়ে অলীক কিছুক্ষণ রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আহ্লাদে আটখানা হয়ে আবার সাইকেলের সিটটায় এক ঘুষি মেরে বলে উঠল, ফাইন। তুমি ঠিক পারবে।

॥ সাত ॥

যুগলচরণ গড়গড়িকে মোটেই কিছু ভাল লাগে নি বোয়াল মশাইর। বরং মনে হয়েছে লোকটা যেমন দাম্ভিক তেমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং রগচটা। সর্বক্ষণ শুধু বক্তৃতা দিতেই জানে লোকটা।

তাঁর বুকের সেই ধড়ফড়ানিটা কমে গিয়েছিল বেশ, এমন কি ওটা একরকম বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু গড়গড়ি এসেই আবার ওটা বাড়িয়ে দিল।

তখনও তিনি পুকুরের ধারে আরাম কেদারায় বসে। হাতে তাঁর রুবির দেওয়া আত্মহত্যার সেই বইটি। এমনি সময়ে সেদিন মন্দিরা এসে গড়গড়িকে তাঁর কাছে রেখে চলে গেল সিনেমার টিকেট কেনার ব্যবস্থা করতে রুবিকে দিয়ে।

সামনের টুলটিতে বসেই যুগলচরণ বলল, আপনার হাতে ওটা কি বই ?

বইখানা বোয়াল মশাই এগিয়ে দিলেন গড়গড়ির হাতে। অমনি বিদ্রূপের বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল যুগলচরণের মুখে।

হেসে বলল গড়গড়ি, ওঃ এটা বুঝি সেই অধ্যাপকের বই যাঁকে আপনারা ঠকিয়েছেন নামমাত্র রয়ালটি দিয়ে ?

খুবই বিরক্ত হলেন বোয়াল মশাই। এই বই-এর লেখক সেই অধ্যাপকটি যে একথা বলে বেড়ান সে কথা অজানা নয় বোয়াল

মশাইর। ভদ্রলোক নিজে সে কথা তাঁকেও একবার বলেছেন। বলেছিলেন, বোয়াল মশাই নাকি জোচ্চোর এবং লেখক ঠকানোই তাঁর ব্যবসা।

তা অবশ্য গায় মাখেন নি বোয়াল মশাই। কারণ ব্যবসা চালাতে হলে অনেক লোকের অনেক কথাই শুনতে হয় তাঁকে। মেজাজ দেখালে চলে না। তাই তিনি বিনীত নম্র কণ্ঠেই বলেছিলেন, তা অবশ্য বলতে পারেন আপনি। এটা লিখেছিলেন বলেই আমার দু-পয়সা হয়েছে এবং এখনও কিছু কিছু হচ্ছে। আপনি পণ্ডিত লোক, লেখাপড়া শিখেছেন, বইখানা লিখেছেন সখে পড়ে। বই না লিখলেও আপনার চলে। কিন্তু দেখুন আমি মুর্খ মানুষ। আপনাদের এই সব সখের লেখা ছাপিয়েই পেটের ভাত যোগাড় করতে হয় আমাকে। কাজেই পয়সার দিক থেকে আপনাদের যদি একটু না ঠকাই তাহলে আমার চলবে কি করে? সব ব্যবসা মানেই তো লোক ঠকানো। আপনার মত কোনো চাকরি পেলে এ সব কাজে কখনও আমি নাবতাম না।

এই কথা বলে অধ্যাপককে শান্ত করেছিলেন তিনি সেদিন। কিন্তু যুগলচরণের এই কথায় আজ তিনি মনে মনে চটে গেলেন। খুবই অপ্রাসঙ্গিক, নির্লজ্জ এবং অভদ্র মনে হল যুগলচরণের এই কথা।

তবু তিনি হাসিমুখেই বললেন, দেখুন লেখকদের অভিযোগ চিরদিনই থাকে প্রকাশকদের ওপর। আমরা নিজের পয়সা খরচ করে বই ছাপাই বলেই যে সুনামটি তাঁদের হয় সে কথাটা পরে আর তাঁদের মনে থাকে না। তাছাড়া রয়ালটি সম্বন্ধে আলোচনা লেখক ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমরা করি না; করতে পারি না। কাজেই আপনি অন্য কথা বলুন।

কিন্তু গড়গড়ি তা মানল না। ব্যঙ্গভরে বলল, ভাববেন না আপনাদের ব্যবসার খবর কিছু আমি জানি না। জানেন আমি নিজে একজন লেখক ?

বোয়াল মশাই অবাক হয়ে গেলেন। লেখক চিনতে এই প্রথম তাঁর ভুল হল।

তবু তিনি বললেন, তাই নাকি ? আপনার কি বই ?

গড়গড়ি বলল, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের।

বোয়াল মশাই বললেন, পাঠ্যপুস্তক ?

গড়গড়ি বলল, না। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক হতেও কোনো বাধা নেই। বইখানার নাম, ঘনিয়ে এল আঁধার। জেলে বসে লেখা। আজ পাঁচ বছর হল বইটা বেরিয়েছে কিন্তু প্রকাশক বলে কিনা মাত্র পঞ্চাশ খানা নাকি বিক্রি হয়েছে। অথচ আমি নিজে বন্ধু-বান্ধবদের বলে এবং লাইব্রেরীতে প্রায় তিনশ কপির বেশি এই বই কিনিয়েছি। দেখুন দেখি এ সব কি জোচ্চুরি নয় ?

বোয়াল মশাই এ কথারও কোনো উত্তর দেন নি। শুধু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মৃদু হাস্য করে। মনে মনে সংকল্প করেছিলেন, এই লোকটিকে এড়িয়ে চলতে হবে ; তা সে যেমন করেই হোক।

কিন্তু তাতেও গড়গড়ি বাধা দিয়েছিল।

বলেছিল, একি ? আপনি উঠে পড়লেন যে ? বসুন বসুন কিছুক্ষণ গল্প করি আপনার সঙ্গে।

বোয়াল মশাইর মনে হল, লোকটি বিশেষ সুবিধের নয়। কাজেই তিনি বললেন, আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। ডাক্তার বলেছে বিশ্রাম নিতে। কথাবার্তা কম বলতে।

এই বলে বোয়াল মশাই বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

তাই দেখে গড়গড়িও তখন উঠে তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে বলেছিল, আপনি এ সব বাজে ভাঁওতায় বিশ্বাস করেন? কোন ডাক্তার বলেছে এ সব কথা?

বোয়াল মশাই তখন ডাক্তারটির নাম বলেছিলেন। ভেবেছিলেন কলকাতার সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নাম শুনে হয়ত গড়গড়ি চুপ করবে।

কিন্তু ফল হল উল্টো।

গড়গড়ি বলল, এই সব বড় বড় ডাক্তার যেন এক একটি রাঘব বোয়াল। শুধুই হাঁ করে আছে।

শুনে বোয়াল মশাই চমকে উঠেছিলেন। তবু গড়গড়ি থামে নি।

বলেছে, এদের কাজ শুধু রুগীর পয়সা বার করা। রোগ সারাতে পারে না, বোঝেও না কিচ্ছু, কেবল বড বড় কথা বলে। রুগীর যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা আরামে থাকে, বাড়ি গাড়ি করে। এমন আইন হওয়া দরকার যাতে কোনো ডাক্তার রুগীর কাছ থেকে পয়সা নিতে না পারে। তাহলেই দেখবেন এরা সব বাজে ভাঁওতা আর দেবে না।

এই কথা শুনতে শুনতে বোয়াল মশাই সেদিন যখন বাগান পার হয়ে বারান্দায় এসে উঠলেন তখন হঠাৎ গড়গড়ি বলে উঠল, এই সব ভাঁওতাবাজ রাঘব বোয়ালরাই দেশের এক নম্বর শত্রু। গুলি করে এদের মারতে হয়।

তখনই বোয়াল মশাইর বুকটা আবার দুরু দুরু করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, আর না। গড়গড়ির মত এমন উগ্রপন্থী লোক তাঁর ধাতে সইবে না। কাজেই তাঁকে খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। তফাৎ থাকতে হবে রগচটা এই যুবকটির কাছ থেকে।

তাই বারান্দায় এসেই তিনি একটু হেসে নমস্কার করে সোজা চলে গিয়েছিলেন তাঁর ঘরে। তাও হয়ত তিনি পারতেন না যদি তখন মন্দিরা এসে না পড়ত।

মন্দিরাই গড়গড়িকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। সেই সুযোগে বোয়াল মশাই নিজের ঘরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

দুপুরের খাওয়া তাঁর শেষ হয়েছিল গড়গড়ি আসবার আগেই। কাজেই তিনি দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটি বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দুপুরে ঘুমুবার অভ্যাস তাঁর নেই। তাই তিনি 'আত্মহত্যা কি অপরাধ' খানা পড়তে লাগলেন। দেখলেন, লেখক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন যে আত্মহত্যার চেষ্টা যে সভ্যসমাজের আদালতে দণ্ডনীয় এক অপরাধ তার মুলে প্রকৃতই কোনো যুক্তি নেই।

ছোট চটি বই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁর পড়া হয়ে গেল। নিজের প্রকাশিত বই এমনি করে মনোযোগ দিয়ে পড়া বোয়াল মশাইর জীবনে আজ এই প্রথম। তাই তিনি বেশ একটু পুলকিত হয়ে উঠলেন।

ঘড়িতে দেখলেন তিনটে বাজে। বিছানা ছেড়ে উঠে বাগানের ধারে জানালাটার কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

দেখলেন, নিচে মন্দিরা দাঁড়িয়ে। মালীকে দিয়ে বাগানের কাজ করাচ্ছে।

মন্দিরাকে দেখে এখন আর বোয়াল মশাইর ভয় করে না। ওর পোশাকও তেমন উগ্র মনে হয় না। বরং ভালোই লাগে বেশ।

খুবই যত্ন করে রেখেছে তাঁকে মন্দিরা। তাঁর শরীর যাতে ভালো থাকে, খাওয়া-দাওয়া যাতে ঠিক মত হয়, পরিপূর্ণ বিশ্রাম যাতে তিনি পান সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি আছে তার।

খাটতেও পারে এই মন্দিরা। এই তো দুপুরে না ঘুমিয়ে বাগান নিয়ে পড়েছে। অথচ কি রকম ছিমছাম ফিটফাট থাকে সর্বদা।

দোতালার জানালায় দাঁড়িয়ে নিচে মন্দিরার এই কাজ দেখতে বেশ ভাল লাগল আজ বোয়াল মশাইর। এমনি সময় মন্দিরা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, জানালায় বোয়াল মশাই।

অমনি মন্দিরা বলে উঠল এক গাল হেসে, ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন? আসুন নিচে। বাগানটা আজ আপনাকে দেখাই।

বোয়াল মশাইও হেসে বললেন, আচ্ছা আসছি। আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা নিয়ে গায়ে দিয়ে বোয়াল মশাই দরজা খুলে বেরোলেন।

দোতলার সিঁডি দিয়ে নিচে নেবে বারান্দা দিয়ে সোজা গিয়ে বাঁক ঘুরে বাগানের ধারে আর একটি বারান্দায় আসতে হয়। তারপর বাগানের সিঁড়ি।

বাঁকের মুখে এসেই বোয়াল মশাই দেখলেন যুগলচরণ আসছে ঐ বারান্দা দিয়ে। দেখেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন; তারপর পিছু হটে পাশের ঘরে ঢুকে পডলেন। এই ঘরটিতে কাপড়-চোপড় বাক্স ইত্যাদি থাকে।

হাতের কাছে যে আলমারীটি ছিল তার হাতল ধরে টানতেই সেটি খুলে গেল। বোয়াল মশাই দেখলেন, ওটা ময়লা কাপড়ের আলমারী। দ্বিধা না করে তিনি তারই ভেতর ঢুকে চুপটি করে বসে

রইলেন। ভাবলেন, গড়গড়ি চলে গেলেই ওটা থেকে তিনি বেরোবেন।

কিন্তু তা হল না।

মিনিট দু-এক বসে থাকবার পরই আলমারীর দরজা হঠাৎ খুলে গেল, এবং অবাক হয়ে বোয়াল মশাই দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে যুগলচরণ গড়গড়ি। ভ্রূকুটি করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে, একি? আপনি? এখানে বসে কি করছেন?

॥ আট ॥

মন্দিরার আজ অনেক কাজ। গড়গড়ি এসেছে। তার যাতে উপযুক্ত যত্ন হয়, রুবি যাতে ভালো করে ওর সঙ্গে মিশতে পারে এবং ঐ অপদার্থ বেকার অলীক ছোঁড়াটার সংস্পর্শ কাটিয়ে যুগলচরণের মত এমন একটি উপযুক্ত পাত্রের দিকে ঝুঁকতে পারে তার সব রকম সুযোগ-সুবিধা মন্দিরাকেই করে দিতে হবে। তাই নিয়েই আজ সে খুব ব্যস্ত।

এই জন্যই মন্দিরা আজ নিজে স্টেশনে যায় নি গড়গড়িকে আনতে। পাঠিয়েছিল রুবিকে বোয়াল মশাইর গাড়িতে।

বোয়াল মশাই লোকটিও সত্যি খুব ভাল। গাড়িখানা ছেড়ে দিয়েছেন মন্দিরারই হাতে। প্রায় দিন দশেক হতে চলল একদিনও তিনি নিজে গাড়িতে চড়েন নি। বাড়ির বাইরেও যান নি। মন্দিরা এবং রুবিই রোজ বেরিয়েছে ঐ গাড়িতে করে। গাড়িখানা হাতে থাকায় মন্দিরার সুবিধে হয়েছে খুবই।

আজও মন্দিরা এই গাড়িতে করেই পাঠাচ্ছে রুবিকে গড়গড়ির সঙ্গে সন্ধ্যেবেলার সিনেমা শোতে।

মন্দিরা জানে, গড়গড়ির সঙ্গে কথা বলেই বুঝেচে, তার দিক থেকে কোনো বাধাই হবে না। কারণ রুবিকে গড়গড়ির যে ভাল লেগেছে তা ওর চাউনি দেখেই বুঝে নিয়েছে মন্দিরা।

কিন্তু মন্দিরার আসল ভয় রুবিকে নিয়ে। মেয়েটা প্রথম থেকেই কেমন যেন বিগড়ে আছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য ঐ অলীক ছোঁড়াটা। বি. এ পাশ করে ছোঁড়াটা বখে গেল। কাজকর্ম কিছু না করে শুধু রুবির মাথাটি খেয়ে বসে রইল নিজে নিষ্কর্মা হয়ে।

নইলে অমন চালাক-চতুর ছেলে যদি ভালো কোনো কাজকর্ম করত মন্দিরা নিজেই যেচে ওর সঙ্গে রুবির বিয়ে দিত। কিন্তু কাজ করা ওর ধাতে নেই। ও জানে শুধু কম বয়েসী মেয়েদের মাথাটি খেতে ; আর পরকালটি ঝরঝরে করতে। তাই মন্দিরা ওকে বারণ করে দিয়েছে এ বাড়িতে আসতে।

এজন্যও বোয়াল মশাইর সাহায্য মন্দিরার খুব দরকার। রুবি অবশ্য মন্দিরার অবাধ্য কখনও হবে না ; কিন্তু এই ব্যাপারে জোর জবরদস্তি মন্দিরা চায় না। রুবির ভালোর জন্যেই চায় না। মন্দিরা চায় ওকে বুঝিয়ে রাজী করাতে। সেই বোঝানোর জন্যই বোয়াল মশাইকে তার খুব দরকার।

মন্দিরা বুঝেচে বোয়াল মশাই রুবিকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন। রুবিও তা জানে। কাজেই মন্দিরার মনে হয়েছে তার কথা না বুঝলেও রুবি হয়ত বোয়াল মশাইর কথা বুঝবে।

তাই মন্দিরা মনে মনে বোয়াল মশাইকে খুঁজছিল। এমনি সময় মন্দিরা দেখতে পেল জানালার ধারে বোয়াল মশাই দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন।

হেসে মন্দিরা বলল, ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন ? আসুন নিচে, বাগানটা আজ আপনাকে দেখাই।

বোয়াল মশাইর পরিবর্তনটা মন্দিরা বেশ বুঝতে পারে। আগে

তিনি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। মন্দিরার দিকে চোখ তুলে সোজা তাকাতেও কেমন যেন ভয় পেতেন। এখন সে ভয় কেটে গেছে। সহজভাবে তিনি এখন তাকাতেও পারেন, হাসি ঠাট্টা পর্যন্ত করতে পারেন। দেখে ভারী মজা লাগে মন্দিরার।

এ বাড়িতে এসে বোয়াল মশাইর সত্যি খুব উপকার হয়েছে। চেহারাও যেমন ভাল হয়েছে তেমনি তাঁর অসুখও সেরেছে। অসুখটা যে বিশেষ কিছুই না মন্দিরা প্রথম দিনেই বুঝেছিল। সামান্য একটু সেবা যত্ন আর বিশ্রামেই যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন তাও মন্দিরা বুঝেছিল বলেই এখানে তাঁকে নিয়ে এসেছিল অমন জোর করে।

তখন মন্দিরা অবশ্য ভেবেছিল তার লেখা বইগুলি ছাপানোর জন্যই বোয়াল মশাইকে দরকার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাড়ির মধ্যে এ রকম বয়স্ক একজন লোক যদি থাকে তাও খুব সুবিধে। এই তো উনি আছেন বলেই মন্দিরা রুবির ব্যাপারটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করবে বলে ভেবেছে। বোয়াল মশাইর সাহায্য নেবে বলে ঠিক করেছে।

বোয়াল মশাই এসে পড়লেন।

মন্দিরা হেসে বলল, বলুন বোয়াল মশাই শরীর এখন ভাল ?

হেসে বোয়াল মশাই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আপনার অনুগ্রহে ভালই আছি আজকাল।

মন্দিরা বলল, তাহলে চলুন বাগানটা আপনাকে দেখিয়ে দিই ঘুরে ঘুরে। আপনি তো এসে অবধি পুকুরের ধারে ঐ ইজি চেয়ারটাতেই বসে বসে কাটালেন এই আট-দশদিন ধরে।

বোয়াল মশাই হেসে বললেন, তা ঠিক। এখনও কিছুই দেখি নি আমি। চলুন দেখে আসি।

বোয়াল মশাইকে নিয়ে মন্দিরা এগিয়ে চলল। প্রায় বিঘা পাঁচেক জায়গা নিয়ে ফলের বাগান। আম, জাম, লিচু, বাতাবী এবং সুপারী গাছে এই বাগান ভরা। আশ্বিন মাস, তাই এখন গাছে শুধু বাতাবী ফলেছে।

বোয়াল মশাইর খুব ভাল লাগল নিরিবিলি এই জায়গাটি। বাগানের মধ্য দিয়ে একটা খাল। তার ওপরে ছোট্ট একটি নৌকা। বোয়াল মশাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, এ যে দেখছি সত্যি সত্যি নন্দন কানন।

মন্দিরা বলল, এই খালটায় মাত্র কোমর পর্যন্ত জল। নৌকোটায় ছোট একটা হাল্কা বাঁশের লগি আছে। ইচ্ছে হলে বসে বেশ চালানো যায়। নৌকোটাও খুব হাল্কা। আমি নিজেই চালাতে পারি। রুবিও পারে। উঠে দেখবেন নাকি একবার পারি কি না?

বোয়াল মশাই অভিভূত হয়ে গেলেন। ছেলেবেলায় নিজেও তিনি নৌকো চালিয়েছেন; কিন্তু সে পরিবেশ আর এ পরিবেশে কত তফাৎ। আজ মন্দিরার মত এমন আধুনিকা একটি মহিলা বলছে নৌকো চালাবে আর তিনি নিজে বসে থাকবেন সেই নৌকোর হাল ধরে। হায় হায় এই সৌভাগ্যটি তাঁর জীবনে এত দেরীতে এল কেন? অন্তত বছর দশেক আগে এলেও তো পারত!

বুকের ভেতরটা তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল। বোয়াল মশাই চমকে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এই মোচড়ানো এতদিনকার পুরনো সেই বুকের ব্যাধিটি নয়। অসুখের সেই বুক ধড়ফড়ানি

নয়। বিচিত্র এর অনুভূতি। এর ভেতরে যেমন ব্যথা আছে, তেমনি আছে অজানা এক আনন্দ, অনির্বচনীয় সুখের নতুন এক স্বাদ।

বোয়াল মশাইর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ আজ বদলে গেল। মন্দিরাকে নতুন এক চোখে তিনি এইবার দেখলেন।

কাজেই তিনি বলে উঠলেন এক গাল হেসে, আমাকে আপনি বুড়ো হাবড়া ভাববেন না। উঠে বসুন এই নৌকোয়। দেখুন আমি কি রকম চালাতে পারি।

॥ নয় ॥

মাতঙ্গী সিনেমায় আজ বড্ড বেশী ভিড়। পরাগ কেশর এবং ফুলকুমারীর নতুন ছবি মধুরাতি এক সঙ্গে কলকাতা এবং আগড়পাড়ায় এই প্রথম খুলেছে আজ তিন চারদিন হল।

যুগল চরণ রুবিকে নিয়ে এই ছবি দেখতে এল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বোয়াল মশাইর গাড়িতে চড়ে।

যুগল চরণ সিনেমার ভক্ত নয়। সাধারণত বায়োস্কোপ দেখা সে পছন্দ করে না। ভালোও লাগে না তার অন্ধকারে বসে ছবি দেখতে।

তাঁরও অবশ্য একটা গোপন কারণ আছে। যে বয়সে এই সব জিনিস ভালো লাগে সে বয়সে যুগল চরণ অর্থকষ্টে দিন কাটিয়েছে। দুবেলা মেসে শুধু ডাল-ভাতই খেতে পেয়েছে কোনওরকমে। তাই বায়োস্কোপের জন্য বাজে খরচ করা তখন আর সম্ভব হয় নি তার।

পরে যখন হাতে পয়সা এল তখন যুগল চরণ রাজনৈতিক দলে ঢুকে পাকা হয়ে গেছে। কি করে দেশের দুঃখ কষ্ট দূর হয় এবং সেই সঙ্গে নিজের জন্যও দু পয়সা বেশী কামানো যায় সেই দিকেই তার নজর তখন। কাজেই দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সিনেমায় বসে সময়ের অপব্যয় করা তার পছন্দ হত না।

বন্ধুবান্ধব অথবা মক্কেলের পাল্লায় পড়ে কখনও যে যুগল চরণ

বায়োস্কোপ দেখে নি সেও অবিশ্যি সত্যি নয়। বলতে গেলে, অনেকবারই সে গিয়েছে কিন্তু ছবি কিছুই দেখে নি সে। ঘর অন্ধকার হলে নিউজ রিল শেষ হবার পরই সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যুগল চরণ। এমন কি অনেক সময় নাক ডাকিয়েছে পর্যন্ত।

তাতেও যুগল চরণের কোনো লজ্জা নেই। অপ্রস্তুতও সে হয় না। হেসে বলে, কি করব ভাই, এ সব ইংরেজি সংলাপ আমি বুঝি না। তাই ঘুমিয়ে পড়ি। আর বাংলা ছবির সময় বলে, ন্যাকামো করে প্রেম নিবেদন আর গান আমার ধাতে সয় না। তার চেয়ে দু ঘণ্টা ঘুমুলে অনেক বেশী আরাম হয়।

কিন্তু রুবির মত এমন একটি আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়া যুগল চরণের জীবনে এই প্রথম। তাই যুগল চরণ প্রথমে স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিল মন্দিরার মুখে এই কথা শুনে। ভাবতেই পারে নি, আধুনিকা কোন মহিলা অমন অনায়াসে তার মেয়েকে যুগল চরণের সঙ্গে সিনেমায় পাঠাতে পারে একা। তাই কান দুটি তার লাল হয়ে উঠেছিল। বলতে পারে নি যুগল চরণ যে বায়োস্কোপ দেখতে সত্যি তার ভাল লাগে না।

তবু ঘণ্টা দুই অন্তত যে রুবির পাশে বসে থাকা যাবে অন্ধকার ঘরে সেই সুখের আশাতেই যুগল চরণ বুক বেঁধে ছিল।

বিকেলে আবার সেদিন স্নান করেছিল যুগল চরণ। তার আগে আবার সে দাড়ি গোঁফও কামিয়েছিল। ধোপ দুরস্ত কাপড় জামা বার করে রুমালে এসেন্স পর্যন্ত ঢেলেছিল সেদিন বিকেলবেলা সিনেমা যাবার আগে।

চায়ের টেবিলে একসঙ্গে চা খেয়েছিল যুগল চরণ মন্দিরা এবং রুবির সঙ্গে। অবাক হয়ে দেখেছিল এবেলা রুবির গালে রক্তিম

আভা, চোখে অদ্ভুত এক দীপ্তি। অজানা কোন সুখের আশায় রুবির চোখ মুখ যেন জ্বল জ্বল করছে।

যুগল চরণ কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা সম্বন্ধে সে বিশেষ পারদর্শী নয়। অথচ মন্দিরা এবং রুবি এই নিয়েই আলোচনা শুরু করেছে দেখে যুগল চরণ এক ফাঁকে কথার মোড় ঘুরিয়ে তার ছেলেবেলার গল্প শুরু করে দিল।

ছেলেবেলাটা তার কেটেছে রামকৃষ্ণ আশ্রমে। পরোপকার এবং কৃচ্ছ্র সাধনে। গ্রামের কোথাও আগুন লাগলে কি করে তারা ছুটে যেত দল বেঁধে ও কুয়ো থেকে কিংবা পুকুর থেকে বালতি করে জল তুলে একজন আর একজনের হাতে তুলে দিত লাইন করে, তারপর আগুন নেভানো হত; সেই গল্প ফলাও করে বলতে লাগল।

যুগল চরণ তখন দেখেছিল, মন্দিরা তো মুগ্ধ হয়ে গেছেই রুবি পর্যন্ত উৎসুক হয়ে বলেছে, তাই নাকি? পরের বিপদ দেখলে এখনও আপনি এগিয়ে আসেন তাহলে?

উঁচু দরের হাসি হেসে যুগল চরণ বলেছে, তা যাই বই কি, দরকার হলে।

চায়ের টেবিলে বসে যুগল চরণের মনে হয়েছিল, সকালে রুবি যতটা বিরূপ ছিল তার প্রতি, এ বেলা আর ততটা নেই। অনেকখানি সহজ হয়ে গিয়েছে একটি বেলার মধ্যেই।

কাজেই খুশি মনে যুগল চরণ মাতঙ্গী সিনেমায় এসেছিল রুবির সঙ্গে, মনে অনেক আশা নিয়ে।

কলকাতায় যে কটি সিনেমায় যুগল চরণ গিয়েছে তা সবই তাপ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এখানে তা নেই। তবু হলে ঢুকে যুগল চরণ দেখল, সিট খুবই ভাল, গদি আঁটা এবং পাখার নিচে।

সাংঘাতিক ভিড়। হলে একটি সিটও খালি নেই। যে লাইনে ওরা বসেছে সেটা হলের মাঝামাঝি। অন্য কোনো মেয়ে সে লাইনে নেই। রুবির পাশের সিটটা খালি ছিল। অন্ধকার হবার পর কে একটি ছেলে যেন ওখানে এসে বসল এইটুকুই যুগল চরণের মনে আছে।

তারপর আর কিছুই সে জানে না। নিউজ রিল শেষ হবার পর কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে যুগল চরণের কিছুই আর তা মনে নেই। খেয়াল হল যখন ইনটারভ্যালের জন্য আলো জ্বলে উঠল। যুগল চরণ ঘুম ভেঙ্গে সোজা হয়ে বসল।

মুখ ঘুরিয়ে দেখল, রুবি মিট মিট করে হাসছে তারই দিকে তাকিয়ে।

যুগল চরণও হেসে বলল, ছবিটা বেশ। তাই না?

হেসে রুবি বলল, হ্যাঁ। আপনি একটা কাজ করবেন যুগল বাবু? হলের বাইরে রাস্তার ওপর যে দোকানটা আছে সেখান থেকে মিঠে পান নিয়ে আসবেন একটা আমার জন্য?

যুগল চরণ বলল, নিশ্চয়। এ আর এমন কঠিন ব্যাপার কি? আর কিছু চাই? লেমনেড কি চা? কিংবা চকোলেট?

রুবি বলল, না। আপনি শুধু পানই নিয়ে আসুন।

যুগল চরণ উঠে যেতেই রুবি পাশের সিটে অলীকের দিকে ঝুঁকে তার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলল, দেখলে তো? কেমন লাগছে এই গড়গড়িকে?

অলীক বলল, লোকটা একটা স্কাউনড্রেল। তোমার দিকে এমন করে তাকায় যেন গিলে খাবে।

রুবি অলীকের হাতে একটি চিমটি কেটে বলল, তা থাক না। তুমি ওকে রুখবে কি করে? কিন্তু যাই বল লোকটা কিন্তু খুব

খারাপ নয়। শো আরম্ভ হবার পর থেকেই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুল। আর তাই তো আমি তোমার দিকে হেলে বসতে পারলাম তোমার হাত ধরে।

অলীক বলল, কিন্তু তবু আমি বলছি রুবি, লোকটা মোটেই কিন্তু সুবিধের নয়। ওকে যদি তুমি প্রশ্রয় দাও তাহলে কিন্তু ঠকবে।

রুবি বলল, খুব যে লাভ লোকসানের হিসেব করছ মশাই ; এক্ষুনি যদি এসে পড়ে গড়গড়ি তাহলে তোমার কি হবে জান?

অলীক চমকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দরজাটা দেখে নিল। তারপর বলল, যে দোকানে তুমি পাঠিয়েছ মিঠে পান আনতে এত শিগগির আর আসতে হয় না। এ বাবা কলকাতা শহর নয় যে তোমার জন্য মিঠে পান সেজে রেখেছে আগে থেকেই। কিন্তু আমি বলছিলাম—

রুবি হঠাৎ অলীকের হাতটা ঠেলে দিয়ে একটু সরে বসে বলল, থাক তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। ফিরে তাকিয়ে দেখ কে এসেছে।

আবার চমকে ঘাড় ফিরিয়ে অলীক দেখল সত্যি গড়িগড়ি ঢুকেছে হাতে পান নিয়ে। তক্ষুনি ইনটারভ্যাল শেষ হয়ে গেল। বাতি নিভে গেল।

রুবি নিজে থেকে বলেছে মিঠে পান নিয়ে আসতে তাইতেই যুগল চরণ ধন্য হয়ে গেছে। বাইরে এসে পানের অর্ডার দিয়ে যুগল চরণ তাই পর পর তিনটি বিড়ি ফুঁকে দিয়েছে। তারপর পানে মিঠে মশলা এবং গোলাপ জল লাগিয়ে ঠোঙা হাতে হলে ঢুকে একগাল হেসে সেটি রুবির হাতে তুলে দিল।

তখন আবার ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে ইনটারভ্যালের পর।

পানের ঠোঙা হাতে নিয়ে রুবি মিস্টি হেসে বলল, ধন্যবাদ।

তারপর ঠোঙা থেকে একটি পান তুলে গড়গড়ির দিকে এগিয়ে দিল।

যুগল চরণের মনে হল সত্যি সে আজ ধন্য। মনে মনে সংকল্প করল আজ আর সে ঘুমুবে না, বাকি ছবিটা সত্যি সে আজ দেখবে। রুবির পাশে বসে।

রুবি কিন্তু একটি পান মুখে পুরে ঠোঙাটি নাবিয়ে চেয়ারের ডান পাশে ধরে রইল সামনে ঝুঁকে। আর সেই ফাঁকে অলীক হাত বাড়িয়ে একটি পান তুলে নিল ঠোঙা থেকে, তারপর নিজের মুখে পুরে দিল।

তিন জনে পাশাপাশি বসে আছে অন্ধকার হলে মাতঙ্গী সিনেমায়। যুগল চরণ, রুবি এবং অলীক। ছবি দেখছে মধুরাতি। তিন জনেরই মুখে মিঠে পান।

যুগল চরণ ভাবছে, সত্যি আজ তার মধু রাতি। পাশে তার রুবি, সামনে ঝুঁকে বসে আছে বাঁ হাতের কনুইটি চেয়ারের হাতলে রেখে। সেই হাতলেই যুগল চরণ তার ডান হাত রেখেছে। আর একটু এগোলেই রুবির ঐ নিটোল বাহুটি ছোঁয়া যায়। ভাবতেই পুলকে যুগল চরণের রোমাঞ্চ হল সারা দেহে। যুগল চরণ সাহস করে পরে হাতখানা আরও একটু এগিয়ে দিল।

রুবি বুঝেছে যুগল চরণ এবার আর ঘুমোয় নি। এখনও বেশ জেগে আছে, আর সরে আসতে চাইছে তারই দিকে। কাজেই রুবি বাঁ হাতখানা চেয়ারের হাতল থেকে সরিয়ে নিজের কোলে নিয়ে বসল।

রুবিকে অমনি করে হাত সরিয়ে নিতে দেখে যুগল চরণ দমে

গেল। বুকটাও তার দুরু দুরু করে উঠল ভয়ে। রুবি চটে গেল নাকি? অন্ধকারে বার বার তাকিয়েও যুগল চরণ রুবির মুখটা ঠিক দেখতে পেল না। ধীরে ধীরে নিজের হাতটি আবার সে গুটিয়ে নিল।

রুবিও তখন একটু নড়ে চড়ে বসে তার হাতটা আবার রাখল চেয়ারের ঐ হাতলে।

ইনটারভ্যালের আগে অলীক দেখেছে, রুবি তারই দিকে সরে বসেছে, হাতে হাত রেখেছে, কিন্তু এখন তার এ কি হল? সেই যে সামনে ঝুঁকে বসে আছে একটুও আর নড়ছে না। কি ব্যাপার?

আস্তে আস্তে অলীক তার পাটি এগিয়ে দিল রুবির পায়ের দিকে। রুবির পায়ে জুতো। সেই জুতোয় অলীকের পা যেই লাগল অমনি রুবি দিল একটি গুঁতো অলীকের পায়ে। কাজেই অলীক পা সরিয়ে নিয়ে হাত চালাল পানের ঐ ঠোঙায়।

ওদিকে যুগল চরণ চুপচাপ বসে আছে। সাহস করে আর রুবির হাতের দিকে নিজের হাত এগিয়ে দিতে পাচ্ছে না। এমনি করে কাঁহাতক আর জেগে থাকা যায়? মিছি মিছি? কাজেই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তাই দেখে রুবিও অমনি সরে বসল অলীকের গা ঘেঁষে। পানের ঠোঙাটি অলীকের হাতে দিয়ে তার হাতটি ধরে বসল।

মধুরাতি ছবি যখন শেষ হল, আলো জ্বলল, যুগল চরণ জেগে উঠল। অলীক তখন উঠে দাঁড়িয়েছে পানের ঐ ঠোঙা হাতে। যুগল চরণের সেদিকে লক্ষ্য নেই। ঘুম ভেঙ্গে সে তাকিয়ে আছে রুবির দিকে। রুবি ফিরে তাকাতেই একগাল হেসে যুগল চরণ বলল, বেশ ছবিটা। তাই না?

॥ দশ ॥

আজ সারাটা বিকেল বোয়াল মশাই মন্দিরার সঙ্গে কাটিয়েছেন খালের ওপর নৌকায় চড়ে ; পাশাপাশি বসে। খুবই ভাল লেগেছে তাঁর আজকের এই বিকেলটা। মনে হয়েছে তিনি যেন তাঁর যৌবন ফিরে পেয়েছেন। অথচ আজকের মত এত আনন্দ এত সুখ যৌবনেও তিনি কখনও পান নি। মন্দিরার মত এমন একটি নারীর সঙ্গে হাসি গল্পে সময় কাটানো জীবনে এই তাঁর প্রথম।

বোয়াল মশাইর মনে অদ্ভুত একটা ফুর্তি এসেছে। জোর এসেছে। আজ যদি মন্দিরা তার লেখার কথা তুলত তাহলে অনায়াসে তিনি ছাপতে রাজী হয়ে যেতেন মন্দিরার একটি মাত্র কথায়। কিন্তু মন্দিরা তা বলে নি।

মন্দিরার সব কথাই তাঁর আজ ভাল লেগেছে শুধু একটি মাত্র কথা ছাড়া। সেই কথাটি গড়গড়ির।

রুবি যাতে গড়গড়ির ওপর খামোখা চটে না যায় তার জন্যই বোয়াল মশাইর সাহায্য চেয়েছে মন্দিরা।

মিনতি করে বলেছে, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন বোয়াল মশাই। ও এখনও নিতান্তই ছেলেমানুষ। আমরা যা ভাল বুঝি ও তা বুঝবে কি করে ?

এইখানেই বোয়াল মশাই একটু ইতস্ততঃ করেছেন। বলতে

পারেন নি, ঐ গড়গড়ি লোকটি বিশেষ সুবিধের নয়। কারণ রুবির যদি ওকেই হঠাৎ ভাল লেগে যায় তাহলে তাঁর ভালো লাগা না লাগার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যদি না লাগে? রুবিকে তিনি ভরসা দিয়েছেন এখন মন্দিরাকে বলবেন কি করে সে কথা? রুবিকেই বা কি বোঝাবেন?

আজকের এই মধুর সন্ধ্যায় এই কথাটাই তাঁর মনে খচখচ করে বিঁধছে। তবু তিনি দমে যান নি। বলেছেন, বেশ তো সিনেমা দেখে রুবি ফিরে আসুক বলব এখন আমি বুঝিয়ে।

এই একটি মাত্র কথায় মন্দিরার মুখখানা খুশিতে কৃতজ্ঞতায় যে রকম জ্বল জ্বল করে উঠেছিল বোয়াল মশাইর তাও খুব ভাল লেগেছে।

মন্দিরাকে খুশি দেখলে তাঁরও যে খুব ভাললাগে এই কথাটা আজই প্রথম বুঝলেন বোয়াল মশাই। তাই বাগান থেকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে মন্দিরা যখন নিজের জন্য চা এবং তাঁর জন্য সরবতের হুকুম দিল বোয়াল মশাই তখন হঠাৎ বলে উঠলেন—

আমিও আজ চা খাই আপনার সঙ্গে, কি বলেন?

মন্দিরা কিন্তু অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, সেকি? আপনার হঠাৎ কি হল? না না চা খেয়ে আপনার কাজ নেই। রাত্রে শেষে ঘুম হবে না।

বোয়াল মশাই হেসে বললেন, ঘুম ঠিক হবে ওষুধ খেলে, সে জন্য ভাববেন না। খুব ঘুরলাম আজ আপনার সঙ্গে অনেক দিন পর। তাই মনে হচ্ছে চা খেলে বোধ হয় ভালই লাগবে আজ। চায়ে তো শ্রান্তি দূর হয় তাই না?

হেসে মন্দিরা বলল, বেশ তাহলে খেয়ে দেখুন ওষুধের মত।

বোয়াল মশাই চা খেলেন, এবং কি আশ্চর্য খুবই উপাদেয় মনে হল তাঁর মন্দিরার হাতে তৈরী আজকের এই চা।

চা খেয়ে তিনি মন্দিরার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলেন ড্রইংরুমে বসে।

মন্দিরা জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বোয়াল মশাই এত ভাল ভাল বইএর খোঁজ আপনি পান কি করে? নতুন নতুন এত সব ভাল ভাল লেখকই বা আপনার কাছেই আসে কোত্থেকে?

এ প্রশ্ন নতুন নয়। সবাই তাঁকে এই প্রশ্নটিই করে। কিন্তু সেই প্রশ্নের বাঁধা ধরা যে উত্তর তিনি সবাইর কাছে দেন, সে উত্তর আর আজ তিনি দিতে পারলেন না এই মন্দিরার কাছে, বিকেল বেলা অমন করে নৌকো চড়বার পর। সত্যি কথাটাই তাঁর মুখ দিয়ে আজ বেরিয়ে এল নিজের মনের আবেগে।

হেসে বলতে শুরু করলেন বোয়াল মশাই, সবাই ভাবে বুঝি আমি পড়াশুনা করি খুব এবং খোঁজ খবরও রাখি যথেষ্ট। কিন্তু সে সব স্রেফ বাজে কথা। নতুন লেখক কিংবা ভালো লেখা আমি ধরি নামীসব সাময়িক পত্রিকা থেকে। এই সব পত্রিকায় যে সব লেখা বেরোয় ধারাবাহিক ভাবে, তাই নিয়ে লোকে আলোচনা করে। আমি সেই দিকে একটু কান রাখি। যেই শুনি পাঁচজন মহিলা পাঠিকা এই লেখার সুখ্যাতি করেছেন তক্ষুনি আমি ছুটি ঐ পত্রিকার আপিসে। আপিস থেকে নতুন এই লেখকের ঠিকানাটি সংগ্রহ করে সোজা গিয়ে তার বাড়িতে হাজির হই।

আশ্চর্য হয়ে মন্দিরা বলল, তাই নাকি? তারপর?

বোয়াল মশাই বললেন, তারপর আর কি? নতুন লেখক প্রকাশককে বাড়িতে দেখেই হাতে যেন স্বর্গ পায়। ভাবে তার লেখা

সার্থক হয়েছে। এইবার তার বই বেরোবে নিখরচায়। সেই আনন্দেই সে মশগুল হয়ে থাকে। বই ছাপিয়ে আমার কি লাভ হবে সে হিসেব সে আর খতিয়ে দেখে না তখন। তাইতেই আমি নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পারি। কনট্রাক্টটি সই করিয়ে নিই নাম মাত্র রয়ালটি দিয়ে। লেখকও তাতে খুশি হয়, আমারও তাতে লাভ হয়।

মন্দিরা বলল, সব নতুন লেখকই কি আপনি এমনি করে পেয়েছেন? সবই ঐ সাময়িক পত্রিকা থেকে?

হেসে বোয়াল মশাই বললেন, হ্যাঁ। যেদিন থেকে এই পদ্ধতিটি আমি ধরেছি সেদিন থেকেই আমার প্রতিষ্ঠানের সুনাম আরম্ভ হয়েছে।

এই বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বোয়াল মশাই বললেন, কিন্তু এখন দেখছি সে সুনামও আর রাখা চলবে না। নতুন লেখা পাওয়া যাবে না আর ওভাবে।

উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল মন্দিরা, কেন? কি হয়েছে?

বোয়াল মশাই আপসোস করে বললেন, সাময়িক পত্রিকার যারা মালিক তারাও এখন নিজেরাই এক একটি প্রকাশক সেজে বসছে। লেখা ছাপাবার আগেই কথা পাকা হয়ে থাকে, ঐ খানেই বই ছাপাতে হবে। বলুন দেখি আমরা তাহলে বাঁচি কি করে?

এমনি সময় গড়গড়িকে নিয়ে রুবি সিনেমা দেখে ফিরে এল।

বোয়াল মশাই দেখলেন, রুবির চোখে মুখে খুশি যেন উপছে পড়ছে। নাচতে নাচতে যেন রুবি ঘরে এসে ঢুকল। ছুটে এসে মন্দিরার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, খুব ভাল ছবি মা। কাল তুমি দেখে এস।

গড়গড়ির দিকে বোয়াল মশাই আর তাকালেন না। গড়গড়ি

কিন্তু তাঁরই পাশে এসে বসল। বোয়াল মশাই একটু সরে গেলেন। সোজা মন্দিরা আর রুবির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মন্দিরা বলল, যাও তোমরা হাত মুখ ধুয়ে এস আমি খাবার দিতে বলি।

রুবি ছুটে বেরিয়ে গেল ; গড়গড়ি কিন্তু গেল না।

বলল, আমার ওসব দরকার নেই। ততক্ষণ আমি না হয় বোয়াল মশাইর সঙ্গে একটু গল্প করি এইখানে বসে।

কিন্তু বোয়াল মশাই তা মানলেন না। মন্দিরাকে উঠতে দেখে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

তাই দেখে গডগড়িকে মন্দিরা বলল, আচ্ছা তুমি বাবা একটু বস তাহলে এই ঘরে। বই টই কিছু পড়। কেমন ?

এই বলে বোয়াল মশাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরা খাবার ঘরে ঢুকল।

খাবার ঘরে ঢুকে মন্দিরা হঠাৎ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বোয়াল মশাই, ওদের দুজনকে বেশ মানাবে, তাই না ?

রুবির ঐ নেচে নেচে চলা, আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ এবং ছুটে এসে মন্দিরার গলা জড়িয়ে ধরা দেখে বোয়াল মশাইর মনেও ঠিক এই ধারণাই হয়েছিল যে গড়গড়িকে হয়ত রুবির ভালো লেগেছে।

তাই তিনিও সায় দিয়েই বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে।

নিজের মনের আবেগে গদ গদ হয়ে মন্দিরা হঠাৎ তখন এক কাণ্ড করে বসল। বোয়াল মশাইর হাত দুখানি নিজের হাতে ধরে খুব জোরে ঝাঁকিয়ে মন্দিরা বলে উঠল, আশীর্বাদ করুন বোয়াল মশাই তাই যেন হয়। ওরা যেন সুখী হয়।

এই বলে বোয়াল মশাইর হাত ছেড়ে মন্দিরা ছুটে বেরিয়ে গেল, রান্নাঘরের দিকে।

বোয়াল মশাই অভিভূত হয়ে গেলেন। বিস্ময়ে আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। খাবার ঘরের চেয়ারে ধপ করে বসে হাত দুখানি নিজের গালে দিয়ে ভাবতে লাগলেন সুখের এই অনুভূতির কথা।

তাঁর চমক ভাঙ্গল যখন রুবি হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদলে খাবার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, একি বোয়াল মশাই গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছেন?

বোয়াল মশাই চমকে উঠে হেসে বললেন, ভাবছি তোমারই কথা। কেমন লাগল এই গড়গড়িকে?

রুবি ডানহাতের তর্জনী ঠোঁটে তুলে ফিস ফিস করে বলল, আস্তে বলুন। পাশের ঘরেই গড়গড়ি বসে আছে। খাবার পর সব কথা বলব আপনার ঘরে গিয়ে।

খাবার টেবিলে বসে বোয়াল মশাই কোনো কথা বললেন না। কথা বলল রুবি এবং গড়গড়ি। রুবি বলল, সিনেমার কথা; আর গড়গড়ি বলল, দেশের দুর্দশার কথা। গভর্ণমেণ্টের নানাবিধ প্রচেষ্টার কথা।

বোয়াল মশাই চুপ করে শুনলেন। খাওয়া শেষ হলে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন, কাউকে কিছু না বলে।

একটু পরেই দরজায় মৃদু আঘাত শোনা গেল। বোয়াল মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

বাইরে থেকে ফিস ফিস করে রুবি বলল, আমি রুবি। দরজা খুলুন শিগগির।

বোয়াল মশাই দরজা খুলতেই রুবি ছুটে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এই গড়গড়ি লোকটা সত্যি ভারী অসভ্য। এমন একটা চোয়াড়ে লোককে মার যে ভাল লাগল কি করে তাই আমি ভেবে পাই না।

বোয়াল মশাইর প্রথম থেকেই রুবিকে খুব ভাল লেগেছে। নিজের মেয়ের মত তাই রুবিকে তিনি স্নেহ করেছেন, ভালবেসেছেন। কিন্তু কখনও ভাবেন নি, দুজনের মন ঠিক একই সুতোয় বাঁধা। তিনিও ভেবে পান নি আজ সারাদিন ধরে, কি করে ঐ গড়গড়িকে ভাল লাগল, মন্দিরার মত এমন একটি বুদ্ধিমতী মহিলার।

তাই তিনি রুবির পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। আমিও আজ সারাদিন ঐ কথাই ভেবেছি। লোকটা যেমন দুর্মুখ এবং ঠোঁটকাটা তেমনি কাণ্ডজ্ঞানহীন। তাই আমি দুপুর থেকেই ওকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছি কিন্তু পারি নি।

কৌতুহলী হয়ে রুবি জিজ্ঞাসা করল, সে আবার কি? আপনার সঙ্গে ওর কি হল?

বোয়াল মশাই হেসে বললেন, আমি দেখেছি ও চায় আমার সঙ্গে গল্প করতে আর কথা বলতে। কিন্তু আমি তা চাই না। আজ বিকেলে বারান্দায় ওকে দেখে আমি গিয়ে তোমাদের বক্স-রুমে ময়লা কাপড়ের আলমারীতে লুকিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু গড়গড়ি এমন নাছোড়বান্দা যে ঐ ঘরে ঢুকে আলমারীটা খুলে আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, এ কি? আপনি এখানে বসে কি করছেন?

শুনে রুবি হেসে উঠল। বলল, তাই নাকি? আচ্ছা শয়তান তো! তা আপনি কি বললেন?

বোয়াল মশাই বললেন, আমি কি আর বলব? আলমারী থেকে বেরিয়ে কোনোও কথা না বলে বাগানে চলে গেলাম। ও বোধহয় ভাবল, আমার মাথাটি বিলকুল খারাপ।

রুবি বলল, দেখুন দেখি এই লোকটাকেই কি না মা বলছে বিয়ে করতে। লোকটা একে অসভ্য তার ওপর বিড়ি খায়। ওর সঙ্গে যদি আমাকে আরও ঘুরতে হয় তাহলে সত্যি আমাকে বিষ খেতে হবে; কিম্বা মরতে হবে গলায় দড়ি দিয়ে।

বোয়াল মশাই রুবিকে সান্ত্বনা দিলেন। ভরসা দিলেন। বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ তোমায় বিয়ে দেবে না। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যাও।

রুবি যখন দরজার কাছে এল, বোয়াল মশাইর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

তিনি বললেন, কিন্তু রুবি সিনেমা দেখে যখন তুমি ফিরলে দেখলাম তোমার চোখ মুখ যেন জ্বল জ্বল করছে। মনের খুশি যেন সারা দেহে উপছে পড়ছে। সেটা তাহলে কি?

বোয়াল মশাইর দিকে সলজ্জ এক কটাক্ষ হেনে রুবি বলল, ওঃ, সে কথা বলব কাল।

এই বলে দরজা খুলে রুবি বেরিয়ে গেল অর্থপূর্ণ মধুর একটু হেসে।

॥ এগারো ॥

পরদিন সকাল বেলা অলীককুমার সাইকেলে চড়ে স্টেশনের কাছে মোড়ের মাথায় এল। সাইকেল থামিয়ে সামনের দোকানে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। এখান থেকেই রুবিদের বাড়িটা দেখা যায়। দোকানের সামনে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে অলীক রুবিদের ঐ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

যুগল চরণ গড়গড়ির সঙ্গে রুবির বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে শুনে অবধি অলীকের মনটা বিশেষ ভাল নেই। আজ সকালে তো সাংঘাতিক খারাপ হয়েই আছে বলা চলে। নইলে এই সময়ে তার থাকবার কথা আগড়পাড়া তরুণ সঙ্ঘের পূজো-জলসার আড্ডায়। সেখানে না গিয়ে অলীক এখানে এসে দাঁড়িয়েছে যদি হঠাৎ কোনোও ফাঁকে রুবির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই আশায়।

চা খেল অলীক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাইকেলটা নিজের কোমরে হেলান দিয়ে রেখে। তারপর একটা সিগারেট ধরালো।

সিগারেট যখন শেষ হল তখনও যখন রুবির কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না তখন অলীক সাইকেলে চেপে ঘুরে এল এক চক্কর রুবিদের বাড়ির পাশ দিয়ে। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে টুং টুং করে বেল বাজিয়ে ধীরে ধীরে সাইকেল চালালো, তবু রুবির দর্শন পাওয়া গেল না, না জানালার ফাঁকে, না গেটের কাছে। অলীককুমারের মনটা তখন আরও বেশী দমে গেল।

আবার ঐ চায়ের দোকানে ফিরে সাইকেলটা রেখে অলীক আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে চেয়ার টেনে বসল। এমন ভাবে বসল যাতে রুবিদের ঐ বাড়িটা ওখান থেকেও দেখা যায় ঐ চেয়ারে বসে। কত খদ্দের এল কত খদ্দের গেল, অলীক কিন্তু নড়ল না। খবরের কাগজের একখানা পাতা হাতে নিয়ে অলীক একবার ঐ কাগজের দিকে তাকায় আর একবার রুবিদের ঐ বাড়িটার দিকে। অন্য কোনো খদ্দের যখন ঐ পাতাটি টান দেয় অলীক তখন সেটি ছেড়ে অন্য একটি পাতা ধরে। কখনও বা শুধু হাতেই ঐ বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুবির প্রতি অবশ্য অলীকের বিশ্বাস খুব বেশী। এমন মেয়ে সত্যি আর হয় না। কি বুদ্ধি! ওর মা ভেবেছিলেন গড়গড়ির সঙ্গে সিনেমায় পাঠিয়ে কাজটা বেশ এগিয়ে আনবেন। কিন্তু কেমন বুদ্ধি খাটিয়ে রুবি সব তা বানচাল করে দিল। কাজেই ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেওয়া অত সহজ হবে না।

তাই তো অলীক বলেছে রুবিকে এমন কিছু করতে যাতে ওর মা গড়গড়ির ওপর চটে যান। কিন্তু সেই এমন কিছুটা কি? রুবি কি সত্যি কিছু পারবে? যদি না পারে?

ভাবতেই অলীকের বুকের ভেতরটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি অলীক আবার একটি সিগারেট ধরালো।

যদি অলীক বেনামীতে একটা চিঠি লেখে রুবির মার কাছে গড়গড়ির নিন্দে করে তাহলে কি হয়? যদি লেখে লোকটা চরিত্রহীন? অত্যন্ত বদরাগী?

কিন্তু রুবিকে না জানিয়ে তাও অলীক করতে পারে না। যদি রুবি চটে যায়? তাহলে?

অতএব আগে একবার দেখা করতে হয় রুবির সঙ্গে। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

ভাবতে ভাবতে অলীকের খেয়াল হল, গতকাল নাচের রিহার্সেলে রুবির যাবার কথা ছিল কিন্তু সে যায় নি। কাজেই তরুণ সংঘের নাম করে রুবিকে ডেকে পাঠানো যায় অনায়াসে। হাতের লেখা দেখলেই রুবি বুঝবে কার চিঠি। তারপর নিশ্চয়ই দেখা করবে। না হলে, একটা খবর দেবে নিশ্চয়ই।

কাজেই অলীক উঠে পাশের মনিহারী দোকান থেকে দু-পয়সা দিয়ে একখানা কাগজের পাতা কিনে একটা চিঠি লিখে ফেলল রুবির নামে আগড়পাড়া তরুণ সংঘের পক্ষ থেকে।

লিখল, গতকাল আপনি রিহার্সেলে আসতে পারেন নি বলে কাল কোনো কাজই হয়নি। আজ কখন আসবেন দয়া করে জানাবেন কি?

লিখে সম্পাদকের নাম সই করে দিল।

পাতাটি ভাঁজ করে ওপরে রুবির নাম লিখে অলীকের ভাবনা হল, এটা এখন পাঠাবে কি করে?

সাইকেলে চড়ে আর একবার অলীক রুবিদের বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে এল, টুং টুং করে বেল বাজিয়ে, কিন্তু এবারও রুবিকে দেখতে পেল না।

চায়ের দোকানের কাছাকাছি এসে অলীক দেখল, পাড়ারই একটি বাচ্চা ছেলে পেনসিল কিনতে পাশের দোকানে এসেছে।

কাছে গিয়ে অলীক ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কিরে মণ্টু এবার পূজা-জলসায় ভলানটিয়ার হবি?

খুশির উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠে মণ্টু বলল, হ্যাঁ অলীক দা, নিশ্চয় হব। দেবেন আপনি করে?

অলীক বলল, যাস তাহলে আজ বিকেলে তরুণ সংঘে। তার আগে এই চিঠিটা নিয়ে চট করে রুবিদিকে দিয়ে আয় তো?

মণ্টু চিঠিখানা নিয়ে বলল, এক্ষুনি দিয়ে আসছি এক ছুটে। উত্তর নিয়ে আসব?

অলীক মণ্টুর সঙ্গে একটু এগিয়ে এসে চুপি চুপি বলল, ছাখ চিঠি কিন্তু শুধু রুবির হাতেই দিবি। দেখিস মাসিমা যেন দেখতে না পান। আর খদ্দর পরা চোয়াড়ে চেহারার জোয়ান মত এক ভদ্রলোক আছে তার হাতেও কক্ষনো দিবি না। বুঝলি? বলবি জলসার রিহার্সেলে কাল কেন রুবি যায় নি তার খোঁজ নিতে এসেছিস।

মণ্টু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ছুটে চলে গেল। আর অলীক ঐ চায়ের দোকানের সামনে সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

রুবিদের গেটের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে মণ্টু দেখল বাড়ির ভেতর কেউ কোথাও নেই ধারে কাছে। তাই সোজা রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়েই মণ্টু হঠাৎ পড়ে গেল বোয়াল মশাইর মুখোমুখি।

বোয়াল মশাই রোজকার মত পুকুরের ধারে না বসে আজ পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন বাগানে। বাড়ির পাশে এই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোড় ঘুরেই দেখলেন এই ছেলেটি আসছে গুটি গুটি।

বোয়াল মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, কি খোকা! কাকে চাও?

মণ্টু ভেবেছিল একটু এগোলেই রুবির সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তার বদলে অপরিচিত এবং বয়স্ক এই ভদ্রলোকের সামনে পড়ে মণ্টু একটু ঘাবড়ে গেল।

এঁকে তো কখনও মণ্টু দেখে নি রুবিদির বাড়িতে অথবা এই শহরে। অলীকও তো এঁর কথা কিছু বলে দেয় নি তাকে। তাই বেচারা একটু থতমত খেয়ে গেল।

বলল, রুবিদি নেই ?

গম্ভীর স্বরে বোয়াল মশাই বললেন, কেন ? কি দরকার ?

অলীকের নির্দেশ মত মণ্টু চটপট বলে ফেলল, কালকে রুবিদি জলসার রিহার্সেলে যান নি কিনা, তাই জানতে এসেছি আজ কখন যাবেন। রুবিদি বাড়ি নেই ?

বোয়াল মশাই মণ্টুর হাবভাব দেখেই বুঝেছিলেন ছেলেটা একটু ঘাবড়েছে এবং ভেতরে কিছু ব্যাপার আছে।

তাই তিনি খপ করে মণ্টুর হাতখানা ধরে আরো গম্ভীর গলায় বললেন, কিন্তু তোমাকে এখানে পাঠালো কে ?

এইবার মণ্টু ভয় পেয়ে গেল।

ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলল, অলীক দা।

বোয়াল মশাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় তোমার অলীক দা ?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে মণ্টু বলল, ঐ তো অলীক দা দাঁড়িয়ে আছেন চায়ের দোকানে সাইকেল হাতে। ডাকব তাঁকে ?

এই বলে মণ্টু নিজের হাত টেনে ছুটবার চেষ্টা করল।

বোয়াল মশাই কিন্তু ওর হাত ছাড়লেন না। বললেন, চল দেখি কোথায় তোমার অলীক দা।

মণ্টু বলল, বেশ তো চলুন না। গেটের কাছে গেলেই দেখতে পাবেন ওঁকে।

বোয়াল মশাইর প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, গেটের কাছে

এসে সাইকেল হাতে মোড়ের মাথায় অলীককে একবার দেখেই ব্যাপারটা তিনি বুঝে ফেললেন। এই তাহলে সেই শ্রীমান যার ভয়ে মন্দিরা তাড়াতাড়ি রুবির জন্য আনিয়েছে এই গড়গড়িকে।

বোয়াল মশাই মণ্টুর হাত ধরে ঐ দিকে এগোলেন। বললেন, চল তোমার অলীকদার সঙ্গে আলাপ করে আসি।

মণ্টুকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে অলীক দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল সাইকেল নিয়ে রুবিদের বাড়ির দিকেই মুখ করে। এখন প্রবীণ এক ভদ্রলোককে মণ্টুর হাত ধরে বেরিয়ে এই দিকেই আসতে দেখে ওর বুকটা হঠাৎ দুরু দুরু করে উঠল। কে ঐ ভদ্রলোক? রুবি তো এঁর কথা কিছু বলে নি। ভদ্রলোক মণ্টুর হাতটাই বা ধরেছেন কেন অমন করে? মণ্টু আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে নি তো?

একবার ওর মনে হল সাইকেলে চড়ে পালিয়ে যাওয়াই এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তক্ষুনি খেয়াল হল চিঠিটা যদি মণ্টু হাত ছাড়া করে থাকে তাহলে পালিয়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই। হাতের লেখা থেকেই ধরা পড়ে যাবে অলীক। কাজেই এগিয়ে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোই এখন সমীচীন। এমন কি অন্যায় অলীক করেছে যে ভয়ে পালিয়ে যেতে হবে?

তাই সাইকেলটা ঠেলে অলীক এগিয়ে এল। কাছাকাছি আসতেই মণ্টু বলে উঠল, দেখুন অলীকদা আপনার কথা মত যেই আমি বলেছি রুবিদি কোথায়, অমনি ইনি খপ করে আমার হাত ধরে ফেললেন। এখনও দেখুন ছাড়ছেন না।

অলীক বলল, চিঠিটা কোথায়?

মণ্টু বলল, এই তো পকেটে।

শুনে বোয়াল মশাই হাতের মুঠি একটু আলগা করলেন। অমনি এক ঝটকায় মণ্টু হাত ছাড়িয়ে হাফ প্যাণ্টের পকেট থেকে চিঠিটা বার করে অলীকের হাতে দিল।

অলীক বলল, আচ্ছা তুই এখন যা।. সন্ধ্যার সময় তরুণ সংঘের আপিসে আসিস ঠিক।

বোয়াল মশাই এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে অলীকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মণ্টু যেই ছুটে চলে গেল, অমনি বোয়াল মশাই গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়? বারণ করা সত্ত্বেও তুমি রুবির কাছে চিঠি পাঠাও কোন সাহসে? জান বিধান সভার সভ্য যুগল চরণ গড়গড়ির সঙ্গে রুবির বিয়ে হচ্ছে শিগগিরই?

অলীক চিঠিখানা মণ্টুর হাত থেকে নিয়েই সাইকেলে চড়ে চম্পট দেবার মতলব করেছিল। বোয়াল মশাইর এই কথা শুনে হাত পা ওর হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল। তাই সাইকেলে ওঠা ওর আর হল না।

ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে অলীক শুধু তাকিয়ে রইল বোয়াল মশাইর দিকে, ফ্যাল ফ্যাল করে। নিচের চোয়ালটা ওর ঝুলে পড়ল মুখখানা হাঁ হয়ে।

বার কয়েক ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে অলীক শেষে বলল, কিন্তু রুবি কি রাজী হয়েছে?

এইবার বোয়াল মশাই হাসলেন।

বললেন, কেন হবে না?

এই কথা শুনে উত্তর দিতে গিয়ে অলীক একটি বিষম খেল। তারপর বলল, না মানে, আমি ভাবছিলাম এই রকম লম্পট চরিত্রহীন

এবং বদরাগী একটি লোকের সঙ্গে রুবির বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে ?

পরিহাস করে বোয়াল মশাই বললেন, কিন্তু তোমার চরিত্রটাই বা এমন কি সাধু বাপু ? বিয়ে করবার মুরোদ নেই তবু মেয়েটার পেছনে ঘুর ঘুর করছ। তা ছাড়া যুগল চরণ বিধান সভার সভ্য। জান একদিন সেই হয়ত বাংলাদেশের মন্ত্রী হবে ?

ব্যঙ্গ ভরে অলীক বলল, হোক সে মন্ত্রী। তবু আমি বলব রুবির স্বামী হবার কোনো যোগ্যতাই তার নেই। আমি তো তবু বি. এ পাশ করেছি। ও তো ম্যাট্রিকও পাশ করে নি। রুবি কক্ষনো ওকে বিয়ে করবে না। একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখলেও না।

বোয়াল মশাইর মনে পড়ল সিনেমা দেখে ফেরার পর রুবির সেই জ্বলজ্বলে মুখখানা। তারপর রাত্রে তাঁর ঘরে এসে গড়গড়ির সম্বন্ধে ঐ কটু মন্তব্য করে বেরিয়ে যাবার সময় তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রুবির মুখে লজ্জিত সেই মিষ্টি হাসিখানা।

বোয়াল মশাই ব্যাপারটা সব বুঝে ফেললেন এক নিমেষে। সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, কাল সিনেমা দেখতে গিয়ে রুবি তোমায় বলেছে এ কথা ?

অলীক সগর্বে উত্তর দিল, বলেছে বৈকি।

বোয়াল মশাই বললেন, তাহলে তুমিই ওকে বিয়ে করে ফেল না কেন ?

অলীক বলল, মাসিমা, অর্থাৎ রুবির মা আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না। বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছেন। এখন আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন কেন ? তা ছাড়া আমি তো কোনো চাকরি করি না। বিয়ে করব কি করে ?

বোয়াল মশাই বললেন, কত টাকা মাইনে পেলে রুবিকে তুমি বিয়ে করতে পার ?

অলীক বলল, তা ধরুন গিয়ে শ' দুই টাকা।

বোয়াল মশাই বললেন, রাঘব বোয়াল পাবলিশিং হাউসের নাম শুনেছ ? আমিই তার একমাত্র সত্বাধিকারী। কাল থেকে তুমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করবে। মাইনে পাবে দু'শ টাকা। একমাসের মধ্যে যদি রুবিকে বিয়ে করতে না পার তাহলে বুঝব তুমি একটি অপদার্থ এবং নিষ্কর্মা। চাকরি থেকে তখনই তোমায় বরখাস্ত করব। কিন্তু যদি বিয়ে কর ঐ রুবিকে তাহলে একমাস পরেই তোমার মাইনে হবে আড়াইশ। কেমন রাজী ?

অলীক সোচ্ছ্বাসে বলল, নিশ্চয় রাজী। দেখবেন স্যার একমাসও লাগবে না। সাত দিনের মধ্যেই আমি বিয়ে করে ফেলব যদি ঐ গড়গড়ি এখানে না থাকে।

বোয়াল মশাই বললেন, বেশ তাহলে কাল সকাল আটটায় তুমি কবিদের বাড়ি এস। কাল থেকেই তোমার চাকরি শুরু। আমি আজই বলে রাখব রুবির মাকে যে কাল তুমি আসবে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে।

অলীক বলল, যে আজ্ঞে।

এই বলে বোয়াল মশাইর পায়ে হাত দিয়ে টিপ করে একটি প্রণাম করল, সাইকেলটাকে রাস্তার ওপর কাত করে ফেলে।

॥ বারো ॥

মন্দিরা যা চেয়েছিল তাই সে পেয়েছে। রুবির জন্য আর তার ভয় নেই। ভাবনাও নেই। গত রাত্রে সিনেমা দেখে যখন রুবি বাড়ি ফিরল তখনই মন্দিরা বুঝে ফেলেছে গড়গড়িকে রুবির ভাল লেগেছে।

কাজেই মন্দিরা গড়গড়িকে আর আপনি না বলে তুমি বলেই ডাকতে শুরু করে দিল সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরবার পর থেকে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর মন্দিরা তাই অনেকক্ষণ গড়গড়ির সঙ্গে কথা বলেছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে। তাই থেকে তার ধারণা হয়েছে গড়গড়ি এখনি রাজী রুবিকে বিয়ে করতে। মনে হয়েছে শ্রীমান যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন রুবির প্রেমে। শুধু কেবল মুখ ফুটে বলবার অপেক্ষা।

আজ বিকেলে স্নানের ঘরে ঢুকে নিজের গায় জল ঢালতে ঢালতে মন্দিরা যতই একথা ভাবছে ততই তার মনে আনন্দ হচ্ছে। কোথায় এই বিধান সভার সভ্য যুগল চরণ গড়গড়ি, আর কোথায় ঐ বেকার এবং নিষ্কর্মা অলীক ছোঁড়াটা।

যাক, ঐ সর্বনাশা লক্ষ্মীছাড়াটার হাত থেকে যে রুবিকে বাঁচাতে পেরেছে মন্দিরা তাইতেই আজ তার এত ভাল লাগছে। মনে এত বেশী ফুর্তি হচ্ছে।

স্নানের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গায় সাবান ঘষতে ঘষতে মন্দিরা আজ গান ধরল গুণগুণ করে অনেকদিন পরে।

রুবি এখন বাড়ি নেই। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরই মন্দিরা তাকে পাঠিয়েছে কলকাতায়, বোয়াল মশাইর গাড়িতে করে। গড়গড়িও গেছে সঙ্গে। কথা আছে, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বাজার করে বাড়ি ফিরবে ওরা সন্ধ্যার আগেই। বিকেলে কোনো একটা দোকানে চা খেয়ে নেবে।

সন্ধ্যা হতে এখনও বেশ দেরী আছে। সেই ফাঁকে মন্দিরা স্নানের ঘরে ঢুকেছে।

মন্দিরা ঠিক করেছে, বইএর কথাটা আজই তুলবে বোয়াল মশাইর কাছে। বোয়াল মশাইর কথা মনে হতেই মন্দিরার মুখে কৌতুক মেশানো আত্মতৃপ্তির মধুর এক হাসি ফুটে উঠল।

আয়নার সামনে মুখ মুছতে মুছতে নিজেই মন্দিরা নিজের এই হাসিটি আজ দেখল। ভাবল, রাঘব বোয়াল আজ জালে পড়েছেন। আর তাঁর রক্ষে নেই। বই তাঁকে ছাপাতেই হবে, পরপর পাঁচখানা।

অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে ভদ্রলোকের। এখন আর মন মরা হয়ে সেই ইজিচেয়ারে একা বসে থাকেন না পুকুরের ধারে। গতকাল তো নিজে হাতে লগি ঠেলে নৌকো পর্যন্ত চালিয়েছেন বোয়াল মশাই। তারপর বাড়ি ফিরে যখন চা খেতে চাইলেন, মন্দিরা তো তাজ্জবই বনে গিয়েছিল একেবারে। আজও তিনি চা খেয়েছেন দু বেলা। সারাদিন মন্দিরার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। মন্দিরার সযত্নে ফেলা টোপটি গিলে ফেলেছেন এখন রাঘব বোয়াল বঁড়শি শুদ্ধ। আটকে গেছে সেই বঁড়শি রাঘব বোয়ালের গলায়। সুতোটি আছে

ছিপের মাথায় মন্দিরারই হাতে। কাজেই তিনি এখন ঘুরছেন যেমন ঘোরাচ্ছে মন্দিরা নিজের ইচ্ছে মতন।

বিকেলে মন্দিরা যখন স্নান করতে এল, তখন বোয়াল মশাই আবার চললেন ঐ খালের ধারে। বলে গেছেন, আপনি স্নান সেরে আসুন। আমি ঐ নৌকাতেই থাকব। সূতো ছেড়ে দিয়েছে মন্দিরা। চলে গেছেন বোয়াল মশাই খালের ঐ ধারে। বসে আছেন নৌকায় মন্দিরারই প্রতীক্ষায়।

বেশ লাগছে মন্দিরার আজ পরিপাটি করে সাজতে। নিজের অঙ্গে গন্ধ দ্রব্য মাখতে। আর গুণগুণ করে গান গাইতে।

তার লেখা উপন্যাস এবার ছাপা হবে। দোকানে দোকানে শো কেসে থাকবে। লোকের হাতে হাতে ঘুরবে। কি অদ্ভুত আনন্দ একথা ভাবতে।

সন্ধ্যা হবার আগেই মন্দিরা সাজ সেরে বারান্দায় এসে বসল। রুবিরা এলে রান্নার ব্যবস্থা করে তবে মন্দিরা বোয়াল মশাইর কাছে যেতে পারবে খালের ধারে ঐ নৌকায়। এ যেন নতুন এক অভিসার মন্দিরার জীবনে।

কিন্তু রুবিরা এল অনেক দেরী করে সন্ধ্যো হবার পর। তারপর এসেই যুগল চরণকে তার সামনে রেখে রুবি বলে গেল, আপনি একটু বসুন। আমি স্নানটা সেরেই আসছি।

যুগল চরণ আবার চা খেতে চাইল। কাজেই মন্দিরাকে চা তৈরী করে দিতে হল। চা খাওয়া শেষ হল তবু যখন রুবি এল না তখন মন্দিরাকেই বলতে হল বাধ্য হয়ে, তুমি বাবা বাগানটায় একটু দেখো। ওখানেই বোধহয় রুবি আছে।

এই বলে মন্দিরা তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকল ব্যবস্থা করতে।

এদিককার কাজ শেষ হলে পর মন্দিরা যেতে পারবে বোয়াল মশাইর কাছে, খালের ধারে ঐ নৌকায়; একান্ত নির্জনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপন সেই অভিসারে।

বোয়াল মশাই ওদিকে বসে আছেন আজ বিকেল থেকেই, সেই নৌকোয়। সারাটা দিন আজ আর তাঁর গড়গড়ির সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই মনটাও তাঁর খুব প্রফুল্ল। তার ওপর মন্দিরা বলেছে, এইখানেই সে আসবে সন্ধ্যার একটু পরেই। তাই মনের আনন্দে মশগুল হয়ে বোয়াল মশাই প্রথমে ছিলেন বসে, তারপর শুয়ে পড়লেন ঐ নৌকোটিরই ওপর।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হল, তারা উঠল আকাশে। গাছে গাছে পাখির কিচির মিচির বন্ধ হয়ে গেল একসময়। তবু বোয়াল মশাই আর নড়লেন না। মাথার নিচে দু হাত দিয়ে পা ছড়িয়ে তেমনি চিত হয়ে শুয়ে রইলেন ঐ নৌকোর ওপর।

অভ্যাস মতন প্রথমেই মনে পড়ল তাঁর ব্যাবসার কথা। বইএর মলাট, ছাপাখানা, দপ্তরী এবং লেখকদের রয়ালটির কথা। বিজ্ঞাপনের কথা। কলকাতায় থাকলে সবাই মিলে এই সন্ধ্যায় তাঁকে ছেঁকে ধরত। সব লেখকই চায় তার বইটির বিজ্ঞাপন দেয়া হোক ফলাও করে। কিন্তু তাঁকেও যে ভাবতে হয় তাঁর নিজের লাভ লোকসানের কথা সে কথাটা কেউ ভাবে না। আপনজন এমন কেউ নেই বোয়াল মশাইর যে তাঁর কথাটাও ভাবে একটু।

এ বেশ হয়েছে যে সব ছেড়ে তিনি পালিয়ে এসেছেন মন্দিরার এই বাড়িতে। সব ঝামেলা ফেলে এসে স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন মন্দিরার দয়ায়। কত অল্পসময়ে এই মন্দিরা কত আপন হয়ে উঠেছে বোয়াল মশাইর মনে। তার বই নিশ্চয়ই তিনি ছাপিয়ে দেবেন,

'সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি' নাম দিয়ে। মন্দিরা খুশি হবে ভাবতেই তাঁর বুকটা আবার নেচে উঠল আনন্দে। বার বার ভাবলেন বোয়াল মশাই, সত্যি অনেক সুখ আছে মন্দিরার এই স্বর্গে।

কিন্তু স্বর্গের নন্দনকাননেও নাকি কাঁটা থাকে; সাপ থাকে। বোয়াল মশাইর মনে হল, এখানেও তা আছে। ঐ কাঁটা এবং সাপ, যুগল চরণ গড়গড়ি।

সেই কাঁটাটি উৎপাটন করে সাপের মাথায় ডাণ্ডা মারার ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন আজ বোয়াল মশাই অলীকের সঙ্গে দেখা করে। কাল সকালেই সে আসছে তাঁরই প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে। এই কথাটিই আজ তিনি বলবেন মন্দিরার কাছে নৌকো থেকে ওঠবার আগে।

মন্দিরা বলেছে অলীক বেকার এবং নিষ্কর্মা বলেই রুবির সঙ্গে বিয়েতে তার আপত্তি। বোয়াল মশাই তাই ওকে চাকরি দিয়েছেন। রুবিও তাকে ভালবাসে। কাজেই গড়গড়ির আর স্থান নেই এখানে। কালই তাকে চলে যেতে হবে এই বাড়ি ছেড়ে। এই কারণে বোয়াল মশাই এখন খুবই শান্তি পেয়েছেন মনে। নৌকোর ওপর চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছেন তাঁর সৌভাগ্যের কথা। মন্দিরার কথা।

এখানে এসে শরীর তাঁর সেরেছে। মনটাও হয়েছে প্রফুল্ল এবং শান্ত। সত্যি মন্দিরার মত এমন মেয়ে আর হয়না। এই দুর্বল দেহটাকে কেমন তাজা করে দিয়েছে এই ক'দিনের মধ্যেই। এখন মন্দিরার সঙ্গে গল্প করতে তাঁর ভাল লাগে। সর্বদা কাছে কাছে থাকতে ইচ্ছা হয়। এমন কি মন্দিরা পাশে থাকলে ঐ গড়গড়িকে পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারেন।

নৌকোর ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বোয়াল মশাই এসব কথা ভাবছেন আকাশের দিকে তাকিয়ে, এমনি সময় নৌকোর পাশে অন্ধকারে মানুষের গলা শোনা গেল।

"বাঃ কি সুন্দর আকাশের তারা, খালের জলে তার ছায়া, আর ঐ জলে ছোট্ট একটি নৌকো"—

বোয়াল মশাইর ধারণা ছিল এখানে তিনি একা। নিতান্ত নিরিবিলি বলেই এ জায়গাটি তাঁর ভালো লেগেছিল এত। এখন বুঝলেন, তিনি আর একা নন। তা ছাড়া ঐ গলার স্বর যুগল চরণ গড়গড়ির। বোয়াল মশাই চমকে উঠলেন।

তারপরেই তাঁর কানে এল, গড়গড়ি বলছে—আমার মনের কথা তোমার তো অজানা নয় রুবি। কিন্তু তোমাকে আমার · ইয়ে··· মানে, আমাকে তোমার······

প্রথমটায় বোয়াল মশাই ভেবেছিলেন গড়গড়ি বুঝি তাঁকে লক্ষ্য করেই কথা বলেছে। তাই তিনি চমকে উঠেছিলেন। এখন বুঝলেন, তা নয়। গড়গড়ি প্রেম নিবেদন করছে রুবিরই কাছে। আর তাই তিনি শুনছেন নিজের কানে। ছি ছি রুবি যে তাঁর মেয়ের মতন। আর তিনি রুবির পিতৃতুল্য। বোয়াল মশাই লজ্জায় তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে নিজের কান ঢাকলেন। তবু গড়গড়ির কথা তাঁর কানে এল। এখন তিনি কি করবেন ?

ব্যাকুল হয়ে নিজের কান দুহাত দিয়ে ঢেকে বোয়াল মশাই এদিক ওদিক তাকালেন। কিন্তু আত্মগোপন কিংবা পলায়নের কোন পথই তাঁর চোখে পড়ল না এই অন্ধকারে।

অগত্যা নৌকা ছেড়ে রাঘব বোয়াল নেবে পড়লেন খালের ঐ জলে। তাঁর মনে পড়ল মন্দিরা বলেছিল এটায় মাত্র কোমর পর্যন্ত

জল। তাই তিনি চুপি চুপি এগিয়ে চললেন নিঃশব্দে। ভাবলেন এমনি করেই পালিয়ে গিয়ে ওপারে এসে উঠবেন জল ভেঙে।

খালে যদিও কোমর পর্যন্তই জল, কিন্তু মন্দিরা জানত না যে মাঝে মাঝে দুটি একটি এমন গর্তও আছে যেখানে মানুষ পর্যন্ত ডুবে যায়। খালের মাঝামাঝি এসে এমনি একটি গর্তে বোয়াল মশাইর পা পড়ল। এ জন্য বোয়াল মশাই তৈরী ছিলেন না মোটেই। তাই হঠাৎ তিনি ডুবে গেলেন জলে, হুপ করে একটি শব্দ তুলে।

॥ তেরো ॥

রুবি আজ সারাটা দুপুর গড়গড়ির সঙ্গে কাটিয়েছে। অর্থাৎ বাধ্য হয়েছে কাটাতে মন্দিরার জন্য। কিন্তু বাড়ি ফিরেই ভেবেছে আর না। এইবার তাকে পালাতে হবে।

কাজেই প্রথমে সে পালিয়েছে স্নান করবে বলে, তারপর এসেছে এই বাগানে। গড়গড়িও যে তাকে খুঁজতে এই বাগানেই এসেছে তাও রুবি বুঝেছিল। দূর থেকে দেখে পালিয়ে পালিয়ে এসে এই খালের ধারে অবশেষে বেচারা ধরা পড়ে গেল গড়গড়ির কাছে।

গড়গড়িও এই সুযোগটিই খুঁজছিল মনে প্রাণে। রুবিকে এমনি এক অপূর্ব পরিবেশে পেয়ে মনের গোপন কথাটি প্রকাশ করবার অভাবনীয় এক সুযোগ তার ভাগ্যে ঘটে গেল। বলতে শুরু করল যুগল চরণ প্রাণের সেই গোপন কথা।

এমনি সময় জলের মধ্যে হুপ করে একটা শব্দ হল। যুগল চরণ চমকে উঠল। অমনি প্রাণের কথাটিও মুখে আটকে গেল অকস্মাৎ।

রুবি ভয় পেয়ে বলল, দেখুন দেখুন নিশ্চয়ই কোনও লোক। জলে ডুবে রয়েছে।

যুগল চরণ খালের ধারে এগিয়ে এল। অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই।

জোরে চীৎকার করে হেঁকে উঠল যুগল চরণ, কে ওখানে?

কিন্তু এ কথারও কোন উত্তর কেউ দিল না। আবার যুগল চরণ হাঁকল, ওখানে কে ?

এমনি সময় বোয়াল মশাই ভেসে উঠে শুনলেন, গড়গড়ির এই ডাক।

আবার হুপ করে তিনি ডুব দিলেন।

ততক্ষণে রুবি নৌকোর ওপর উঠে পড়েছে গড়গড়ির সঙ্গে।

বোয়াল মশাইকে অমনি করে ডুবতে দেখে ভয়ে রুবি চেঁচিয়ে উঠল, দেখুন দেখুন ঐ যে।

গড়গড়ি একে বিধান সভার সভ্য তার ওপর ছেলেবেলায় রামকৃষ্ণ মিশনে ছিল। পরের বিপদে এগিয়ে যেতে সে ভয় পেল না।

লগিটা হাতে নিয়ে সে তাই নৌকো ঠেলে এগিয়ে চলল বোয়াল মশাইর দিকে। রুবি পাশে দাঁড়িয়ে বলল, ঐ দিকে ; ঐ যে।

বোয়াল মশাই ছেলেবেলায় সাঁতার জানতেন, কাজেই নিজের জন্য তাঁর ভয় ছিল না মোটেই। গড়গড়িকে দেখে পালাবার জন্যই তিনি ডুব দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর বয়েস হয়েছে ; সে দমও আর নেই। কাজেই আবার তাঁকে ভেসে উঠতে হল।

এইবার তিনি দেখলেন গড়গড়ি নৌকোর লগি তুলেছে তাঁরই দিকে। কেন তুলেছে কি ব্যাপার কিছুই তিনি বুঝলেন না। ঝোঁকের মাথায় তিনিও লগির এক প্রান্ত ধরে ফেললেন দুহাত দিয়ে। তারপর দু হাত দিয়ে মারলেন এক টান।

মুহূর্তের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটে গেল।

গড়গড়িও আচমকা এক হ্যাঁচকা টান খেয়ে জলে গিয়ে পড়ল। তাই দেখে রুবি তাড়াতাড়ি লগিটি টেনে নিল নিজের হাতে।

রুবি দেখল জলে পড়েই গড়গড়ি বোয়াল মশাইকে জাপটে

ধরেছে দুহাতে। দুজনেই একবার করে ভেসে উঠছে আবার হুপ করে ডুবে যাচ্ছে জলে।

তাই দেখে রুবি ঐ লগি দিয়ে মারল এক গুঁতো যুগল চরণের পিঠে। গুঁতো খেয়ে যুগল চরণ বোয়াল মশাইকে ছেড়ে নিজের পিঠে হাত দিল।

সেই ফাঁকে বোয়াল মশাইও দেখলেন, তাঁর পায়ের নিচে মাটি; মাত্র কোমর পর্যন্ত জল। তাই তিনিও আর দাঁড়ালেন না। খাল পার হয়ে সোজা বাড়ির দিকে ছুটলেন।

ভেজা কাপড় জামা নিয়ে নৌকোর ওপর উঠে গড়গড়ি এক মুখ জল বার করে বলল, কি আশ্চর্য! লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। ইচ্ছে করেই আজ ডুবে যাচ্ছিল এই জলে।

হঠাৎ রুবির মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। গড়গড়ি তখন নিজের জামা কাপড়ের জল ঝাড়তেই ব্যস্ত, তা ছাড়া অন্ধকারে কারো মুখ স্পষ্ট করে দেখা যায় না। তাই রুবির চোখমুখের এই আকস্মিক পরিবর্তন গড়গড়ির চোখে পড়ল না।

রুবি বলল, আহা বেচারা!

ধুতির কোঁচাটা নিংড়ে মাথার চুলে হাত দিয়ে জল সরিয়ে গড়গড়ি বলল—

লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। একেবারে বদ্ধ পাগল। তা না হলে এ রকম কখনও কেউ করে? নৌকোটা ছিল এখানে, আর ও ছিল খালের ঐ মধ্যিখানে। ওর কাছেই তো আমরা যাচ্ছিলাম। নৌকোর ওপরে অনায়াসে ও উঠে আসতে পারত। কিন্তু তা ও করল না। যেই দেখল আমরা এসেছি ওকে বাঁচাবার জন্য অমনি আমাকে পর্যন্ত বিপদে ফেলে দিল, লগিটা অমনি করে হ্যাঁচকা টান দিয়ে।

রুবি আবার বলল, আহা বেচারা!

গড়গড়ি নিজের ভেজা গা থেকে পাঞ্জাবীটা খুলে জল বার করল নিংড়ে। তারপর বলল, প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল লোকটার মাথাটা ঠিক নেই। কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে সর্বদা। এই তো, কালই ওকে দেখেছি আমি তোমাদের বক্স-রুমে ময়লা কাপড়ের আলমারীর মধ্যে বসে থাকতে। এমন করে লোকটা তাকায় মনে হয় যেন ও ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়।

রুবি আবার বলল, আহা বেচারা! আপনি কি ওঁর কথা কিছুই জানেন না?

বিস্মিত হয়ে গড়গড়ি বলল, কোন কথা?

রুবিও তেমনি আশ্চর্য হয়েই উত্তর দিল, কেন? উনি যে একজন বাতিকগ্রস্থ লোক এবং আত্মহত্যা করতে চান তা কি আপনি জানেন না?

যুগল চরণ গড়গড়ি এই অদ্ভুত কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

রুবি বলে চলল, আচ্ছা ভেবে দেখুন যুগলবাবু একদিন বিধান সভা থেকে বাড়ি ফিরে যদি আপনি দেখেন খাবার টেবিলে আপনার স্ত্রী, বাবা এবং মা একসঙ্গে সব মরে পড়ে আছেন তাহলে আপনার কি রকম লাগে? মনের কি অবস্থা হয়?

এই সাংঘাতিক খবর শুনে গড়গড়ির সারা গায় যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। বলল, কি সাংঘাতিক! কি করে এমনটা হল?

রুবি বলল, তাই হয়েছে বেচারা এই বোয়াল মশাইর ভাগ্যে, খাবারের মধ্যে কি যেন বিষ ছিল।

গড়গড়ি তক্ষুনি বলে উঠল, কালকে যখন আমি এলাম দেখলাম পুকুরের ধারে বসে উনি একখানা বই পড়ছেন তার নাম, আত্মহত্যা

কি অপরাধ? এই বইখানা উনিই ছাপিয়েছেন। তখন তো অতটা বুঝি নি। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আরও অনেক বেশী গভীর। এই রকম একটি অসহায় লোককে তো এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই।

রুবি সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বলল, কিন্তু আপনি কি করবেন? ওঁর পরিবারে যে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে কাউকে তিনি তা জানতে দিতে চান না। ওঁকে যদি আপনি এ নিয়ে কিছু বলেন তাহলে উনি তক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন এবং মা তাতে রেগে যাবে। কারণ মা চায় বোয়াল মশাইকে দিয়ে তার সব বই ছাপাবে। তাই মা ওঁকে এখানে এনেছে। কাজেই মাকে যদি কিছু বলেন মাও তা বিশ্বাস করবে না। ভাববে এ সব বাজে কথা।

গড়গড়ি গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলে দেখছি আমাকেই শুধু ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। দেখতে হবে লোকটা সাংঘাতিক কিছু করে বসে কি না।

রুবি বলল, হ্যাঁ তাই এখন সবচেয়ে ভাল। আপনি শুধু একটু লক্ষ্য রাখুন। দেখুন উনি কি করেন।

এই বলে লগি দিয়ে ঠেলে নৌকোটা রুবি খালের পারে নিয়ে এল।

আশ্বিন মাস। এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে থেকে যুগল চরণের মনে হল যেন বেশ শীত করছে। কাজেই নৌকো পারে এসে লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই সে রুবির কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল জামা কাপড় বদলাতে।

রুবি ফিরল ধীরে সুস্থে। বাড়ির কাছে এসেই দেখল, মন্দিরা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়; ব্যাকুল উদ্বিগ্ন মুখে।

রুবিকে দেখেই মন্দিরা জিজ্ঞাসা করল, এ সব কি ব্যাপার রুবি? একটু আগেই দেখলাম বোয়াল মশাই ছুটে এসে নিজের ঘরে চলে গেলেন ভেজা কাপড়ে। তারপর আবার গড়গড়িও এল সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে। আমি তো মাথা মুণ্ডু কিছুই ভেবে পেলাম না। এদের আজ কি হল?

রুবি বলল, তা আমি জানি নে মা। তবে দেখলাম যুগলবাবু বোয়াল মশাইকে ধরে ঐ খালের জলে আচ্ছা করে চোবাচ্ছেন। ওঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে নিশ্চয়ই। জান তো যুগলবাবু কি রকম বদরাগী?

মন্দিরা শুনে অবাক হয়ে গেল।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, যুগল চরণ বদরাগী? বলিস কি? হতেই পারে না।

রুবি বলল, কি জানি? আমার কিন্তু ভারী অদ্ভুত মনে হল যুগলবাবুর এই কাণ্ড দেখে।

॥ চৌদ্দ ॥

তারপর রুবি সোজা দোতলায় গিয়ে বোয়াল মশাইর ঘরে কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে বোয়াল মশাই বললেন, দরজা খোলাই আছে। ভেতরে এস।

ভেতরে ঢুকে বোয়াল মশাইকে ধোপ দুরস্ত জামা কাপড় গায়ে বসে থাকতে দেখে রুবি যেন খুব আশ্বস্ত হল।

বলল, যাক বাব্বা! আপনি তাহলে ভালই আছেন। খুব বেঁচে গেছেন এ যাত্রায়; কি বলেন?

রুবির গলার স্বরে অত্যন্ত সহজ এই আন্তরিকতা দেখে বোয়াল মশাই অভিভূত হয়ে গেলেন।

রুবি বলল, ভাগ্যিস আমি ছিলাম, নইলে আজ আপনাকে জলে ডুবিয়ে ঠিক মেরে ফেলত ঐ গড়গড়ি।

শুনে বোয়াল মশাই চমকে উঠলেন। বুকটা তাঁর কেঁপে উঠল দুরু দুরু করে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, জলে ডুবিয়ে মারত আমাকে? ঐ গড়গড়ি? বল কি?

বোয়াল মশাইর বিস্ময় দেখে রুবি নিজেও কম আশ্চর্য হল না।

বলল, সেকি? আপনি কিচ্ছু জানেন না? কখনও শোনেন

নি যে এরা হল সেই গড়গড়ি, বংশ পরম্পরায় যারা পাগল? ওর ঠাকুর্দা ছিলেন বদ্ধ পাগল। ওর বাবাও সারাজীবন কাটিয়েছেন রাঁচীর পাগলা গারদে।

বোয়াল মশাইর মুখে চোখে সাংঘাতিক এক পরিবর্তন হল। তিনি কেঁপে উঠলেন থর থর করে।

বললেন, সেকি? না না তা কি করে হবে? মানুষ খুন করবার ঝোঁক ওর ছিল নাকি কখনও?

রুবি বলল, না, তা ছিল না বটে; তবে দেখা গেছে কোনও কোনও লোককে ও সহ্য করতে পারে না। ভীষণ চটে যায় তার ওপর।

বোয়াল মশাই ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, না না আমার ওপর ও চটে নি। বরং বেশ একটু পছন্দই করে মনে হয়। দেখনি, সর্বদা গল্প করতে চায় আমারই সঙ্গে।

রুবি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা আপনি কখনও হাই তুলেছেন কি ওর সামনে? ওর কথা শুনতে শুনতে?

বোয়াল মশাইর মনে পড়ল, তিনি তা করেছেন। শুধু একবার নয় অনেকবার। সেই প্রথম দিনে, যেদিন গড়গড়ি এ বাড়িতে এল, সেদিন ওর কথা শুনতে শুনতে অনেকবারই তিনি হাই তুলেছেন ঐ ইজিচেয়ারে বসে, পুকুরের ধারে।

বোয়াল মশাইর বুকটা দুরু দুরু করে উঠল ভয়ে। তিনি বললেন, হাই তোলা দেখলে ও সত্যি চটে যায় নাকি?

চোখ দুটি কপালে তুলে রুবি বলল, চটে যায় মানে? সাংঘাতিক চটে যায়। আপনি এ করেছেন কি বোয়াল মশাই?

বোয়াল মশাইর চোখ দুটি বিস্ফারীত হয়ে গেল ভয়ে।

তাই দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে রুবি জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বোয়াল মশাই রাত্রে আপনি দরজায় খিল দিয়ে শোন তো ?

ভয়ে আতঙ্কে বোয়াল মশাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে বার দুই ঢোঁক গিলে বললেন, কিন্তু এসব তুমি কি বলছ ? এ যে ভীষণ ব্যাপার ! সাংঘাতিক এক কাণ্ড !

রুবি বলল, জানেন তো আপনার ঘরের পাশেই ওর ঘর।

নিজের মনের উদ্বেগ বোয়াল মশাই আর চেপে রাখতে পারলেন না। ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু এই সব সাংঘাতিক লোককে ছেড়ে রাখা হয় কেন ?

রুবি বলল, বাঃ রে, এখন পর্যন্ত ঐ গড়গড়ি তো তেমন কিছু করে নি। ওকে তাহলে আটকে রাখবেন কি করে ?

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে বোয়াল মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জানেন এই সব কথা ?

ব্যস্ত হয়ে রুবি বলল, না না মা এসব জানবে কি করে ? তাহলে কি আর আমাকে বলে ঐ পাগলা খুনেটাকে বিয়ে করতে ?

গম্ভীর হয়ে বোয়াল মশাই বললেন, ওঁর তো এসব জানা দরকার। এ যে অত্যন্ত ভীষণ কথা।

রুবি বলল, আজকে আর কিছু বলবেন না মাকে। একেই তো আপনাদের দুজনকে ভিজে কাপড়ে বাড়ি ঢুকতে দেখে মা খুব ঘাবড়ে গেছে। বুকের সেই ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। এখন এসব শুনলে হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

বোয়াল মশাই আরও বেশী বিচলিত হয়ে পড়লেন। উদ্বিগ্ন হলেন মন্দিরার এই বুকের ব্যথার কথা শুনে।

কি আশ্চর্য ! মন্দিরারও তাহলে বুকের ব্যামো ? ঠিক তাঁরই মত ?

বোয়াল মশাই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা এখন কোথায় ? এখনও কি বুক ধড়ফড় করছে ? ব্যথা হচ্ছে খুব ?

রুবি বলল, মা খাবার টেবিলে বসে আছে আপনাদেরই জন্য। চলুন নিচে।

বোয়াল মশাই টেবিলের ওপর থেকে তাঁর ওষুধের শিশিটা তুলে নিলেন। এ ওষুধে হার্ট সবল হয়। সুস্থ হয়। ধড়ফড়ানি সেরে যায়। বোয়াল মশাই চট করে একটা বড়ি নিয়ে নিজে খেয়ে ফেললেন। তারপর আর একটি বড়ি রুবির হাতে দিয়ে বললেন, এটি তোমার মাকে আজ খাইয়ে দিও। দেখবে বুক ধড়ফড় কমে যাবে আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

রুবি বলল, চলুন এবার নিচে যাই। রাত্রে কিন্তু খিল দিয়ে রাখবেন দরজায়।

বোয়াল মশাই রুবির কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, তা রাখব নিশ্চয়। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে লক্ষ্মীটি।

রুবি বলল, কি কাজ ?

বোয়াল মশাই বললেন, এই বড়িটি তোমার মাকে খাওয়াবে, আর আজ রাত্রে খাবার টেবিল থেকে উঠে আসবার সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসবে এই ঘর পর্যন্ত। কেমন ?

॥ পনের ॥

রাত্রে আহারাদির পর যুগল চরণ গড়গড়ি নিজের ঘরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। সে বিধান সভার সভ্য। কাজেই তার একটা দায়িত্ব আছে বৈকি! ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে তাই গড়গড়ি ভাবছে গত কয়েক ঘণ্টার কথা।

যুগল চরণের নাকটি সামান্য একটু বাঁকা। তাই মনে হয় ও যেন নাক সিঁটকে রয়েছে সব সময়। এখন যেন তা বেড়ে গেছে আরও অনেক বেশী। মনে হচ্ছে খুবই বিরক্ত হয়েছে আজ যুগল চরণ গড়গড়ি।

বিরক্ত হবার কারণও অবশ্য যথেষ্ট ঘটেছে। শুধু বিরক্ত কেন রাগ হবারও কারণ রয়েছে খুব। যা ঘটেছে তাতে ক্রোধে অন্ধ হয়ে মাথায় হঠাৎ খুন চেপে যাওয়াও এমন কিছু বিচিত্র নয়।

রুবির কাছে প্রেম নিবেদনের শুভ সেইক্ষণটিতেই যুগল চরণ আজ বাধা পেয়েছে। তাকে জলে নাবানো হয়েছে টেনে এবং পিঠে দেওয়া হয়েছে বেশ একটি গুঁতো বাঁশের ঐ লগি দিয়ে।

শুধু তাই নয়। অত দীর্ঘক্ষণ ভেজা কাপড়ে থাকায় যুগল চরণের নাকে মুখে মাথায় বাসা বেঁধেছে সর্দি; এবং খুবসম্ভব দুটি একটি বেঙাচিও হয়ত চলে গিয়েছে পেটে, খালের ঐ নোংরা জলের সঙ্গে।

অবশ্য যুগলচরণের কলেরা টাইফয়েডের ইন্‌জেকশন নেওয়া আছে। তবু এত সব কাণ্ডের পর মেজাজ প্রফুল্ল রাখা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। যুগল চরণেরও ছিল না। এরপর অদূর ভবিষ্যতেও যে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে তারও কোন ভরসা খুঁজে পেল না আজ এই যুগল চরণ গড়্‌গড়ি।

বিধান সভায় মাসের পর মাসের খাটুনির পর যুগল চরণ এখানে এসেছে বিশ্রাম নিতে। এখন সেই বিশ্রাম ছেড়ে, এমন কি রুবির সঙ্গ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে তাকে কিনা অপ্রকৃতিস্থ এক পুস্তক প্রকাশকের ওপর নজর রাখতে হবে, গার্জেন হয়ে বসে।

পুস্তক প্রকাশকদের যে যুগল চরণ খুব ভালবাসে, অথবা বিধান সভায় মনোনীত হবার জন্য যে এই প্রকাশকদের ভোট না হলে তার চলবে না তাও কিছু নয়। তার লেখা 'ঘনিয়ে এল আঁধার' পুস্তক প্রকাশ করে যারা এই পাঁচ বছরে মাত্র পঞ্চাশ কপি বিক্রি করেছে তাদের সঙ্গেও গড়্‌গড়ির খুব বেশী প্রীতির সম্বন্ধ নেই।

তবু যুগল চরণ কর্তব্যের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারল না। হাজার হোক এখনও সে বিধান সভার সভ্য। বিবেক বলে জিনিসটি এখনও তার একেবারে যায় নি। রাঘব বোয়ালের মত এমন একটি ঝানু প্রকাশককে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করে লাভটা তার কি হবে, সেকথা তাই সে আর খতিয়ে দেখতে বসে গেল না আগে।

তাই রুবির চিঠিটি হাতে পেয়েই যুগল চরণ সজাগ হয়ে উঠল। কর্তব্য স্থির করে ফেলল চটপট।

কখন যে রুবি এই চিঠিটা দিয়ে গেছে যুগল চরণের ঘরে, দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে, যুগল চরণ তা জানে না।

আজ রাত্রের আহার যদিও তারা শেষ করেছে একই টেবিলে

বসে, তবু কথাবার্তা বিশেষ আজ হয় নি। অনেকটা নিঃশব্দেই আজ আহার পর্ব শেষ হয়েছে এই বাড়িতে। মন্দিরাই যা দুটি একটি কথা বলেছে; আর তার উত্তর দিয়েছে রুবি। যুগল চরণ যেমন চুপ করেই ছিল বোয়াল মশাইও তেমনি কোন কথা বলেন নি। খাবার শেষে বোয়াল মশাইকে নিয়ে উঠে এসেছিল রুবি। এই টুকুই গড়গড়ি দেখেছে।

তারপর থেকেই যুগল চরণ নিজের ঘরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে চিন্তামগ্ন হয়ে।

চিঠিটা যুগল চরণ দেখল শুতে যাবার ঠিক আগে বাতি নেভাতে গিয়ে। দরজার কাছে মেঝের ওপর এক টুকরো চিঠির কাগজ।

তুলে দেখল রুবি লিখেছে, বোয়াল মশাইর টেবিলের ওপর লম্বা যে ক্ষুরটা খোলা পড়ে আছে তার কি হবে ?

পড়ে গড়গড়ির শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে যেন বরফ জল নেমে গেল।

তাইত ? কি সর্বনাশ ! এখন উপায় ?

এই ক্ষুরের কথাটা তো আগে গড়গড়ির মনে হয় নি। তাই গড়গড়ি আর দাঁড়াল না। বারান্দা দিয়ে চটি ফটফট করে সোজা এসে বোয়াল মশাইর দরজায় কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে বোয়াল মশাইর গম্ভীর স্বর শোনা গেল, কে ?

বোয়াল মশাইর গলা শুনে যুগল চরণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, যাক এখনও তাহলে সব শেষ হয়ে যায় নি। এখনও সময় আছে যথেষ্ট। বোয়াল মশাই বেঁচে আছেন।

গড়গড়ি বলল, আমি যুগল চরণ। ভেতরে আসতে পারি কি ?

ভেতর থেকে বোয়াল মশাই বললেন বেশ একটু ভীত ত্রস্ত স্বরে, কেন ? কি চাই ?

গড়গড়ি বলল, আপনার ক্ষুরটা একটু দেবেন দয়া করে ?

চমকে উঠে বোয়াল মশাই বললেন, কি দেব ?

আবার গড়গড়ি বলল, আপনার লম্বা ঐ ক্ষুরটা, টেবিলের ওপর যেটা খোলা পড়ে আছে।

ভেতরে বোয়াল মশাইর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

গড়গড়ি বলল, কি হল বোয়াল মশাই ? শুনতে পাচ্ছেন ?

তবু বোয়াল মশাই কোন সাড়া দিলেন না। দরজায় কান লাগিয়ে গড়গড়ি শুনতে পেল, ভেতরে কিসের যেন শব্দ, মেঝের ওপর ভারী বাক্স টেনে আনলে ঠিক যে রকম হয়।

গড়গড়ির মনে হল বোয়াল মশাই বাক্স টেনে দরজায় এনে ঠেসে দিলেন।

গড়গড়ি ডাকল, ও বোয়াল মশাই ? শুনতে পাচ্ছেন ?

ভেতরের সেই খসখস শব্দ এই কথায় হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

আবার গড়গড়ি ডাকল, কি হল বোয়াল মশাই ?

তবু বোয়াল মশাই সাড়া দিলেন না। কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় কান পেতে গড়গড়ি অবশেষে ফিরে এল নিজের ঘরে।

এখন যুগল চরণের সামনে মাত্র একটি পথ খোলা। সে পথ বোয়াল মশাইর জানালা। ব্যালকনির ওপর গিয়ে ঐ জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে, যখন বোয়াল মশাই ঘুমুবেন। তারপর ঐ ক্ষুরটি অথবা অন্য কোন অস্ত্র যদি থাকে তাও সংগ্রহ করে আনতে হবে আজই রাত্রে।

ঘড়িতে তখন রাত বারোটা।

যুগল চরণ ভাবল, আরও ঘণ্টা দুই সময় বোয়াল মশাইকে

দেওয়া ভাল। ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়ুন নিশ্চিন্ত হয়ে, ততক্ষণ যুগল চরণ না হয় অপেক্ষা করবে এই চেয়ারে বসে।

ওদিকে বোয়াল মশাই দরজার বাইরে পায়ের শব্দে টের পেলেন গড়গড়ি নিজের ঘরে চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তিনি ওষুধের শিশি থেকে একটি নার্ভ পিল বার করে খেয়ে ফেললেন। তারপর আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

এ নার্ভ পিলটি একাধারে যেমন হার্টের ওপর ভাল কাজ করে তেমনি করে দুর্বল নার্ভের ওপর। রোজ তিনটি করে এই বড়ি তিনি খান। সকালে দুপুরে এবং রাত্রে; শোবার আগে।

যদিও তিনি যথারীতি আজও ওষুধ খেলেন তবু তাঁর মনে হল আজ রাত্রে ঘুমের আশা দুরাশা, ঐ বদ্ধ পাগল গড়গড়িটার এই কাণ্ডের পর। এতরাত্রে চুপি চুপি এসে তাঁর কাছে ক্ষুর চাওয়ার পর থেকেই বোয়াল মশাইর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঘুম ছুটে গেছে ভয়ে। এই ওষুধে এখন তা যাবে কি?

তবু তিনি চেষ্টা করলেন প্রাণ পণে যতটা চেষ্টা সম্ভব মানুষের পক্ষে।

এই রকম পরিস্থিতি হলে, অর্থাৎ ঘুম যখন কিছুতেই আর আসে না, তখন তিনি দুটি একটি মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করে থাকেন। তাতে কাজও বেশ হয় সময় সময়।

আজও ঠিক তেমনি একটি মুষ্টিযোগ তিনি প্রয়োগ করলেন রাত বারোটার সময় ঘুমুতে না পেরে।

মাথাটি বালিসে দিয়ে চোখ বুজে তিনি নিজের মনে বলতে লাগলেন, আমার শরীর বেশ ভাল আছে। আমি সুস্থ হয়েছি।

নার্ভও বেশ শক্ত হয়েছে এখন। রোজ আমি ভালো থেকে আরও ভালো হচ্ছি।

এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, ঐ খুনে উন্মাদ গড়গড়িটা যদি এসে গলায় ক্ষুর বসিয়ে দেয় হঠাৎ, তাহলে ভালো থেকে আরও ভালোবোধ করেই বা তাঁর সুখটা হবে কি?

আবার তাঁর বুকটা ভীষণ কেঁপে উঠল ঢিব ঢিব করে।

তাড়াতাড়ি মনের জোর খাটিয়ে বোয়াল মশাই এই দুর্ভাবনাটা তাঁর মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন দূরে।

বলতে লাগলেন, আমি রোজ ভালো থেকে আরও ভালো বোধ করছি।

ধীরে ধীরে রাঘব বোয়াল তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। চোখ দুটি তাঁর জড়িয়ে এল ঘুমে।

তবু বলতে লাগলেন বোয়াল মশাই, রোজ আমি ভালো থেকে আরও ভালো হচ্ছি। রোজ আমি কালো থেকে আরও কালো হচ্ছি। রোজ আমি আলো থেকে আরও কালো হচ্ছি। ভোজ মামি পালো……

বোয়াল মশাই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘড়িতে রাত দুটো বাজল।

যুগল চরণ চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিল। দেয়াল ঘড়ির ঢং ঢং এই শব্দ শুনে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। এইবার তাকে যেতে হবে পাশের ঘরে ঐ ক্ষুরের সন্ধানে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যুগল চরণ ব্যালকনিতে এল। পাশেই বোয়াল মশাইর জানালা। কান পেতে শুনল, বোয়াল মশাইর নাসিকা গর্জন অন্ধকার ঐ ঘরে।

যুগল চরণের মুখে হাসি ফুটে উঠল অদ্ভুত এক আত্মতৃপ্তির।

জানালা খোলাই ছিল। যুগল চরণ প্রথমে তার ওপর চড়ে বসল। তারপর পা দুখানা নাবিয়ে দিল বোয়াল মশাইর ঘরে।

বোয়াল মশাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তাঁর নাক ডাকছে বেশ জোরে জোরে, কাজেই যুগল চরণ এখন নিশ্চিন্ত। দু মিনিটের মধ্যেই সে বেরিয়ে আসবে কাজটি হাঁসিল করে।

তাই ভেবে যুগল চরণ নেবে পড়ল বোয়াল মশাইর ঘরে নিতান্ত নিরুদ্বেগে জানালা দিয়ে পা ঝুলিয়ে।

কিন্তু জানালার নিচেই ছিল জলের একটি বড় কুঁজো। যুগল চরণের দেহের ভার এই কুঁজোর ওপর পড়ল। ফলে মাটির কুঁজো উল্টে গিয়ে ভেঙ্গে গেল ফট করে। অমনি সারা ঘর জলে জলাকার হয়ে গেল।

বোয়াল মশাইর নাক যদিও ডাকছিল তবু মনে ছিল আতঙ্ক। তাই আজ ঘুম তাঁর গভীর হয় নি ঐ নার্ভ পিলটি খাওয়া সত্ত্বেও। কুঁজো ফাটার এই শব্দে তিনি জেগে উঠে বেড স্যুইচটি টিপে দিলেন খুট করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

মিটমিটে চোখে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে গড়গড়ি। আর তার পায়ের কাছে ভাঙ্গা কুঁজো। ঘর জলে জলাকার।

আতঙ্কে বোয়াল মশাই সোজা হয়ে বসলেন বিছানার ওপর। তাকিয়ে রইলেন গড়গড়ির দিকে চোখ দুটি বড় বড় করে।

যুগল চরণ বলল, এই যে বোয়াল মশাই! জেগে উঠেছেন দেখছি।

বোয়াল মশাইর গলা দিয়ে তখন যে স্বর বেরোল তার অর্থ কিছু

বোঝা গেল না। গলায় কাঁটা ফুটলে বেয়াল যেমন শব্দ করে তেমনি তিনি ফ্যাঁচ করে একটি শব্দ করলেন মাত্র।

গড়গড়ি বলল, আমি—মানে—এই একটু দেখতে এলাম আপনাকে।

বোয়াল মশাই তেমনি তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে গড়গড়ির দিকে।

গলা দিয়ে আবার তাঁর ঐ রকম একটি শব্দ হল—ফ্যাঁচ।

তখন গড়গড়ি বলল, আমি এসেছি আপনার ঐ ক্ষুরটার জন্য। এই যে রয়েছে এখানে।

বোয়াল মশাই কেঁপে উঠলেন ভয়ে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপরই ছিল লম্বা ঐ ক্ষুরটি। গড়গড়িকে ঐ ক্ষুরটি এখন তুলতে দেখে বোয়াল মশাই আর চুপ করে বিছানায় বসে থাকতে পারলেন না। এক লাফে বিছানা থেকে মেঝেতে এসে নাবলেন, আত্মরক্ষার কোনো এক অস্ত্রের সন্ধানে। কিন্তু হাতের কাছে কিছুই তিনি পেলেন না, 'আত্মহত্যা' কি অপরাধ, এই চটি বই খানা ছাড়া। এদিয়ে বড় জোর মাছি মারা যায় কিন্তু এই বিপদে আত্মরক্ষা করা যায় না কিছুতেই।

তাই বোয়াল মশাই পিছু হঠতে শুরু করলেন দরজার দিকে দুহাত ছড়িয়ে।

যুগল চরণ কিন্তু বোয়াল মশাইর দিকে এগোলো না একটি পাও।

অবাক হয়ে বোয়াল মশাই দেখলেন, গড়গড়ি তাঁকে ছেড়ে জানালার দিকে চলে যাচ্ছে ঐ ক্ষুর হাতে নিয়ে। কে বলবে লোকটা পাগল কিংবা খুনে? অথবা তাঁর প্রতি ওর আক্রোশ? গড়গড়ি বলল, আচ্ছা চলি বোয়াল মশাই।

তখনই বোয়াল মশাইর মনে হল, নিশ্চয় রুবি ভুল করেছে। গড়গড়ি কখনও পাগল নয়। খুন করবার ইচ্ছে নেই কখনও। অন্ততঃ তাঁকে তো নয়ই।

কিন্তু জানালার ওপর উঠে বোয়াল মশাইর দিকে মুখ ফিরিয়ে গড়গড়ি এইবার হাসল।

এই হাসি দেখে আবার বোয়াল মশাইর বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। এ হাসি যে উন্মাদের হাসি! বোয়াল মশাইর মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। রুবি ঠিক বলেছে। উন্মাদ ছাড়া, বদ্ধ পাগল ছাড়া, এমন ভেংচি কেটে হাসি আর কেউ হাসতে পারে না। আবার তাঁর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে।

গড়গড়ি আবার তেমনি করে হেসে বলল, আচ্ছা চলি বোয়াল মশাই। এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

বোয়াল মশাই দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মত। কিছুক্ষণ পরে তিনি এগিয়ে এসে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। প্রথমে দিলেন ছিটকিনিটি ভালকরে এঁটে; তারপর লাগালেন লোহার সেই অর্গলটি। শেষে কয়েকটা চেয়ার এনে এই জানালায় ঠেসে দিলেন। বইএর তাকটা টেনে এই চেয়ারের সঙ্গে লাগিয়ে রাখলেন।

এইবার তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন আলোটি জ্বেলে রেখে।

চোখ বন্ধ করে বলতে লাগলেন, রোজ আমি ভাল থেকে আরও ভাল হচ্ছি।

কিন্তু মুখ দেখে তাঁর এই আত্মপ্রত্যয়ের আভাস কিছুই পাওয়া গেল না।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গল বোয়াল মশাইর বেশ ভোরে; কিন্তু আগের দিনের মত লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠতে তিনি পারলেন না। তাঁর

মনে হল, দেহটা তাঁর ভারী হয়ে গেছে একটি মাত্র রাত্রে। মাথাটাও ভার ভার লাগছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে আজ একটুও তাঁর ভাল লাগল না।

তবু তিনি উঠলেন। চেয়ার, বইএর র‍্যাক সরিয়ে অর্গলটি খুলে জানালা খুলে দিলেন। ঘরে রোদ ঢুকল কিন্তু তাঁর বুকে তখন জমাট বাঁধা অন্ধকার। প্রভাত সূর্যের এই আলোতে মনের অন্ধকার তাঁর গেল না।

হাতমুখ ধুয়ে পোশাক বদলে তবু তিনি নিচে নাবলেন; আজও গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলেন রোজকার অভ্যাস মত।

॥ ষোল ॥

খাবার ঘরে রুবি তখন একা। খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে পড়ছে। বোয়াল মশাইকে ঢুকতে দেখে রুবি হেসে উঠে দাঁড়াল।

বলল, এই যে বোয়াল মশাই, আসুন। রাত্রে ঘুম হয়েছে তো ভাল ?

বোয়াল মশাই চেয়ার টেনে বসে গম্ভীর স্বরে বললেন, জান কালরাত্রে সাংঘাতিক এক কাণ্ড হয়ে গেছে।

রুবি যেন চমকে উঠল ভয়ে।

বলল, গড়গড়ি নয় তো ?

বোয়াল মশাই বললেন, হ্যাঁ। ঐ গড়গড়িই।

রুবি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বোয়াল মশাই ?

বোয়াল মশাই বললেন, রাত্রে কাল ঘুমুতে যাব এমনি সময় ঐ লোকটা এসে দরজায় ঘা দিয়ে বলল, আমার ক্ষুরটা নাকি ওর খুব দরকার।

সভয়ে রুবি বলে উঠল, আপনি ওটা দেন নি তো ?

বোয়াল মশাই বললেন, না আমি দিই নি। বরং দরজায় বাক্স টেনে এনে আটকে রেখেছিলাম।

রুবি সোৎসাহে বলল, বাঃ বেশ করেছেন।

বোয়াল মশাই বললেন, কিন্তু রাত দুটোর সময় লোকটা আবার ঘরে এসে ঢুকল, জানালা দিয়ে।

রুবি বলল, কি সাংঘাতিক! তারপর?

বোয়াল মশাই বললেন, তারপর লোকটা আমার ক্ষুর তুলে নিল ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে। কিন্তু তখনই কেন এল না যে আমার গলায় বসাতে, তা আমি জানি না। উন্মাদের মত ভেংচি কেটে হেসে লোকটা আবার চলে গেল ক্ষুর হাতে ঐ জানালা দিয়ে।

রুবি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বোয়াল মশাইও কোনো কথা না বলে এক কাপ চা নিয়ে বসলেন।

খুব ভাল লাগল তাঁর আজকের এই গরম চা।

রুবি বোয়াল মশাইর দিকে রুটি টোস্ট মাখন মাখিয়ে এগিয়ে দিল।

তারপর বলল, দেখুন আমার মনে হয় এখানে থাকা আপনার পক্ষে আর কিন্তু নিরাপদ নয় কিছুতেই।

বোয়াল মশাই বললেন, আমিও তাই ভাবছি আজ সকাল থেকে।

রুবি বলল, গড়গড়ি যে আপনার ওপর রেগে আছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে পরিষ্কার।

বোয়াল মশাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

রুবি বলল, আপনি তাহলে চলে যান চুপি চুপি কাউকে কিছু না জানিয়ে, তাহলে আর গড়গড়ি আপনার পেছনে ছুটতে পারবে না। আপনি গিয়ে বরং জানিয়ে দেবেন মাকে একটা চিঠি লিখে যে বাধ্য হয়েই চলে যেতে হয়েছে আপনাকে গড়গড়ির এই উৎপাতে।

বোয়াল মশাই বললেন, ঠিক বলেছ। তাই ভাল হবে সবচেয়ে।

রুবি বলল, গড়গড়ি যে পাগল সে সব লেখার দরকার কি?

আপনি শুধু লিখবেন গড়গড়ি আপনাকে খালের জলে চুবিয়েছে, তারপর রাত দুটোতে আপনার ঘরে ঢুকে ভেংচি কেটেছে। তাইতেই মা সব বুঝতে পারবে। কি বলেন?

বোয়াল মশাই বলেন, হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি।

এমনি সময় রুবি ফিসফিস করে বলল, চুপ।

বোয়াল মশাই থেমে গেলেন।

যুগল চরণ ঘরে ঢুকল।

রুবি বলল, এই যে যুগল বাবু! আসুন।

যুগল চরণ চেয়ার টেনে বসল বোয়াল মশাইর উল্টো দিকে। গতকালের ঐ ধকলের পর ওর শরীরটাও ঠিক তাজা নেই তেমন। রাত্রে রোজ ছ ঘণ্টা অন্ততঃ ঘুম চাই গড়গড়ির। সেই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে কাল। কাজেই আজ সকালে তার শরীরটাও ম্যাজ ম্যাজ করছে বেশ। তবু মুখে যুগল চরণ আজ খুব সপ্রতিভ।

তার সামনে টেবিলের ওপারে বোয়াল মশাই বসে আছেন। যুগলচরণের মনে হল, যদি কারো এই জীবনের প্রতি বিদ্বেষ ঘটে থাকে, যদি কেউ তার নিজের জীবন শেষ করতে চায় আজই, তাহলে সে ঐ সামনের চেয়ারে বসা বোয়াল মশাই! মুখটি তাঁর আজ যেমন বিমর্ষ তেমনি ভ্রুকুটি কুটিল এবং বীতস্পৃহ।

গড়গড়ি তাই দেখে বোয়াল মশাইকে একটু প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করল।

বলল, আজকের সকালটা সত্যি ভারী অপূর্ব। তাই না বোয়াল মশাই?

মুখ না তুলেই বোয়াল মশাই বললেন, হ্যাঁ।

গড়গড়ি বলল, আজকের এই ভোরে, পাখির গানে এবং সূর্যের

আলোয় যে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে তাই দেখে সবাই আজ মাততে চায়। খুশি হতে চায়। বাঁচতে চায়। কি বলেন?

একটু সন্দিগ্ধ মনেই বোয়াল মশাই বললেন, হ্যাঁ।

গড়গড়ি বলল, আনন্দ ভরা এই পৃথিবী থেকে কে নিজেকে সরিয়ে ফেলতে চায় বলুন দেখি?

খবরের কাগজে চোখ রেখে রুবি হঠাৎ বলে উঠল, ৪৪ নং খ্যাংড়াকাঠি রোডের ঘনশ্যাম তফাদার।

যুগল চরণ গড়গড়ির উচ্ছ্বাস সহসা বাধা পেল।

বিরক্ত হয়ে রুবির দিকে তাকিয়ে বলল, কি বললে?

রুবি বলল, ৪৪ নং খ্যাংড়া কাঠি রোডের ঘনশ্যাম তফাদারকে আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয়েছিল কাল। সে বলেছে—

রুবির বুদ্ধির প্রতি গড়গড়ির খুব বেশী আস্থা ছিল। বোয়াল মশাইর সামনে আজ হঠাৎ এমনি একটি বেফাঁস কথা ওকে বলতে দেখে গড়গড়ি ভুরু কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলল—

তাহলে নিশ্চয়ই ভেতরে কোনো গূঢ় কারণ আছে।

বোয়াল মশাই এতক্ষণ যেন কোন এক সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। কোনো কথা বলেন নি গড়গড়ি ঘরে ঢোকবার পর থেকে।

এখন যেন তিনি হঠাৎ জেগে উঠলেন।

জোর দিয়ে বলে উঠলেন, আত্মহত্যাকে কেন লোকে পাপ বলে, কেন এটা একটা অপরাধ বলে ধরা হয়, কিছুই আমি ভেবে পাই না।

'আত্মহত্যা কি অপরাধে'র লেখক খুব জোরালো ভাষায় তাঁর বক্তব্য লিখেছেন। সদ্য সদ্য এই বইখানি পড়ায় বোয়াল মশাইর

মাথায় সেই সব অকাট্য যুক্তি এখন খেলে গেল। গড়গড়িকে যুক্তিতে পরাস্ত করবার অদ্ভুত এক ঝোঁক তাঁকে পেয়ে বসল।

তিনি বললেন, আত্মহত্যার চেষ্টায় যে আদালতে শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে তার কি কোনো মানে হয়? যে লোক নিজের প্রাণের পরোয়া করে না তার আবার শাস্তি কি?

রুবি আবার তেমনি করে বলে উঠল কাগজে চোখ রেখে, হারাধন পরামানিকের শাস্তি হয়েছে, পনেরো দিন সশ্রম কারাদণ্ড।

গড়গড়ি রুবির দিকে আবার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বলল, তা ঠিক। কিন্তু—

বোয়াল মশাই বললেন, প্রাচীন কালের লোকেরা এ বিষয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল ছিল আমাদের চেয়ে। মেয়েরা নিজের ইচ্ছায় সহ-মরণে যেত। আইন তাতে বাধা দিত না। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দিত না। এখনকার আইন মানে বিলিতি আইন। এখনও এর মধ্যে ও দেশের চার্চের সেই পচা গন্ধ।

বাধা দিয়ে গড়গড়ি বলল, তা ঠিক। কিন্তু—

যুগল চরণকে যে দমিয়ে দিতে পেরেছেন তাইতেই বোয়াল মশাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বললেন, আত্মহত্যাকে যে কেন কাপুরুষের কাজ বলা হয় তাও আমি বুঝি না। নিজের প্রাণটা ধ্বংস করতে যে সাহস পায় নিজের হাতে, সে কাপুরুষ? নিশ্চয় তার মন পাথরের মত কঠিন এবং তার নার্ভ লোহার মত শক্ত।

হঠাৎ বোয়াল মশাইর উচ্ছ্বাসে বাধা পড়ল। লোহার কথায় মনে পড়ে গেল, আজ এখনও তাঁর আয়রণ নার্ভ পিল খাওয়া হয় নি, খাবার ঠিক আধঘণ্টা আগেই যা রোজ খাবার কথা।

বোয়াল মশাই আর সময় নষ্ট না করে পকেট থেকে একটি পিল বার করে মুখে ফেলে দিলেন।

চায়ের কাপ হাতে উল্টো দিকে বসে যুগল চরণ গড়গড়ি বোয়াল মশাইর এই অদ্ভুত যুক্তি শুনছিল এবং লক্ষ্য করছিল বোয়াল মশাইর চোখ মুখ এবং হাব ভাব।

যুগল চরণ দেখল, বোয়াল মশাইর চোখে যেন উন্মাদের এক দৃষ্টি, জীবনটাকে শেষ করে ফেলার দৃঢ় এক সংকল্প। তারপর পকেট থেকে বিষের ঐ বড়িটি বার করে মুখে ফেলে কি অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি!

ঐ সর্বনাশা বিষের বড়ি বোয়াল মশাইর পেটের মধ্যে চলে গেল দেখে যুগল চরণ আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না।

হাতের কাপটি টেবিলের ওপর রেখে গড়গড়ি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, চেয়ার ঠেলে সরিয়ে। টেবিলের ওপর থেকে নুনের বাটিটা তুলে নিল হাতের মুঠোয়। এক্ষুনি ঐ নুন খাইয়ে তুলতে হবে বিষের বড়ি বোয়াল মশাইর পেট থেকে।

চোখে মুখে তার ভীষণ এক আতঙ্ক ফুটে উঠল। এগিয়ে চলল যুগল চরণ বোয়াল মশাইর দিকে। নুনের বাটি হাতে।

বোয়াল মশাই তখন বড়িটি খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করেছিলেন।

বলছিলেন, আমি সত্যি ভেবে পাই না কেন—এর বেশী আর তিনি বলতে পারলেন না।

গড়গড়িকে অমনি করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসতে দেখে বোয়াল মশাইর বাক রুদ্ধ হয়ে গেল।

এখুনি তাঁকে মারবে নাকি ঐ গড়গড়ি? নুনের বাটি দিয়ে মাথায়? নাকি গলা টিপে ধরবে?

বোয়াল মশাই তাকিয়ে দেখলেন দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ ঐ দিকেই গড়গড়ি। কাজেই তিনি উল্টো দিকে দৌড় দিলেন চেয়ার ছেড়ে। এক লাফে জানালা টপকে বাগানে গিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে ছুটে চললেন খালের ধারে।

ফুলের বাগান পার হয়েই ফলের বাগান। ছুটতে ছুটতে এইখানে এসে বোয়াল মশাই পিছন ফিরে দেখলেন গড়গড়িও আসছে ছুটে।

বোয়াল মশাই ডান দিকে মোড় ঘুরলেন। সামনেই একটা আম গাছ। বোয়াল মশাই তাইতেই চড়ে বসলেন প্রাণের ভয়ে। ডাল পালার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইলেন।

গড়গড়ি দেখেছে, তিনি বাড়িটা পার হয়েই ডাইনে ঘুরেছেন। গড়গড়িও তাই এখানে এসে মোড় ঘুরল। দৌড়ে চলে গেল ঐ খালের দিকে। বোয়াল মশাই গাছের ওপর বসে থেকে দেখলেন।

বুক থেকে তাঁর বিরাট এক পাথর যেন সরে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির এক নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি গাছের ওপর বসে।

বোয়াল মশাই আর সময় নষ্ট না করে পকেট থেকে একটি পিল বার করে মুখে ফেলে দিলেন।

চায়ের কাপ হাতে উল্টো দিকে বসে যুগল চরণ গড়গড়ি বোয়াল মশাইর এই অদ্ভুত যুক্তি শুনছিল এবং লক্ষ্য করছিল বোয়াল মশাইর চোখ মুখ এবং হাব ভাব।

যুগল চরণ দেখল, বোয়াল মশাইর চোখে যেন উন্মাদের এক দৃষ্টি, জীবনটাকে শেষ করে ফেলার দৃঢ় এক সংকল্প। তারপর পকেট থেকে বিষের ঐ বড়িটি বার করে মুখে ফেলে কি অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি!

ঐ সর্বনাশা বিষের বড়ি বোয়াল মশাইর পেটের মধ্যে চলে গেল দেখে যুগল চরণ আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না।

হাতের কাপটি টেবিলের ওপর রেখে গড়গড়ি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, চেয়ার ঠেলে সরিয়ে। টেবিলের ওপর থেকে নুনের বাটিটা তুলে নিল হাতের মুঠোয়। এক্ষুনি ঐ নুন খাইয়ে তুলতে হবে বিষের বড়ি বোয়াল মশাইর পেট থেকে।

চোখে মুখে তার ভীষণ এক আতঙ্ক ফুটে উঠল। এগিয়ে চলল যুগল চরণ বোয়াল মশাইর দিকে। নুনের বাটি হাতে।

বোয়াল মশাই তখন বড়িটি খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করেছিলেন।

বলছিলেন, আমি সত্যি ভেবে পাই না কেন—এর বেশী আর তিনি বলতে পারলেন না।

গড়গড়িকে অমনি করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসতে দেখে বোয়াল মশাইর বাক রুদ্ধ হয়ে গেল।

এখুনি তাঁকে মারবে নাকি ঐ গড়গড়ি? নুনের বাটি দিয়ে মাথায়? নাকি গলা টিপে ধরবে?

বোয়াল মশাই তাকিয়ে দেখলেন দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ ঐ দিকেই গড়গড়ি। কাজেই তিনি উল্টো দিকে দৌড় দিলেন চেয়ার ছেড়ে। এক লাফে জানালা টপকে বাগানে গিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে ছুটে চললেন খালের ধারে।

ফুলের বাগান পার হয়েই ফলের বাগান। ছুটতে ছুটতে এইখানে এসে বোয়াল মশাই পিছন ফিরে দেখলেন গড়গড়িও আসছে ছুটে।

বোয়াল মশাই ডান দিকে মোড় ঘুরলেন। সামনেই একটা আম গাছ। বোয়াল মশাই তাইতেই চড়ে বসলেন প্রাণের ভয়ে। ডাল পালার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইলেন।

গড়গড়ি দেখেছে, তিনি বাড়িটা পার হয়েই ডাইনে ঘুরেছেন। গড়গড়িও তাই এখানে এসে মোড় ঘুরল। দৌড়ে চলে গেল ঐ খালের দিকে। বোয়াল মশাই গাছের ওপর বসে থেকে দেখলেন।

বুক থেকে তাঁর বিরাট এক পাথর যেন সরে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির এক নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি গাছের ওপর বসে।

বলছিলেন, ওর হাত থেকে বাঁচতে হলে তাঁকে আজই চলে যেতে হবে এই বাড়ি ছেড়ে। এতক্ষণে বোধ হয় চলেও গেছেন তিনি।

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল মন্দিরা, না না কক্ষনো তিনি যাবেন না আমাকে না বলে। ছাখ তো ওঁর গাড়িটা কোথায়? আর একবার ছুটে গিয়ে ওঁর ঘরটা একটু দেখে আয়। নিশ্চয়ই তিনি বাড়িতেই আছেন।

রুবি ছুটে বেরিয়ে গেল। মন্দিরাও দারওয়ানকে গেট বন্ধ করার হুকুম দিয়ে চাকর মালী সবাইকে ডাকাডাকি করে জিজ্ঞাসা বাদ শুরু করে দিল।

কিন্তু বোয়াল মশাইকে পাওয়া গেল না। বোয়াল মশাইর গাড়ি যেমন থাকে তেমনি গ্যারাজে আছে। ড্রাইভার বলল, বোয়াল মশাই ওদিকে যান নি।

রুবি এসে খবর দিল, বোয়াল মশাইর ঘর খোলাই আছে। জিনিসপত্রও সব রয়েছে কিন্তু তিনি নেই। গেলেন কোথায় বোয়াল মশাই?

রুবি বলল, তিনি বোধহয় বাগানের রাস্তা দিয়ে স্টেশনের দিকেই চলে গেছেন দৌড়তে দৌড়তে। দেখে আসব একবার স্টেশনে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে?

মন্দিরার মনে হল, ওদিকটাও একবার দেখে আসা নেহাত মন্দ নয়।

কাজেই রাজী হয়ে মন্দিরা বলল, বেশ তাই যা। তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

গাড়ি নিয়ে রুবি চলল স্টেশনের দিকে।

আর মন্দিরা চলল বাগানের দিকে চাকর বাকরের দল বল নিয়ে।

ভেবে পেল না মন্দিরা, এই ভোরে কেমন করে উধাও হয়ে গেলেন বোয়াল মশাই তার এই বাড়ি থেকে। গড়গড়িটাই বা কোথায় গেল ?

বোয়াল মশাইর বয়স হয়েছে, অসুস্থ শরীরটা সবে একটু সেরেছে এমনি সময় এ কি বিপত্তি ঘটল ? ঐ জোয়ান গড়গড়ির সঙ্গে দৌড়ে তিনি পারবেন কেন ?

নিশ্চয়ই তিনি আছেন কোথাও কাছাকাছি। তাই মন্দিরা বাগানের মধ্যে এদিক ওদিক দেখতে লাগল ঝোপের আড়াল খুঁজে।

কিন্তু গড়গড়িই বা গেল কোথায় ?

রুবি ঠিকই বলেছে, নিশ্চয়ই লোকটার মাথা খারাপ। নইলে বোয়াল মশাইর মত এমন নিরীহ গোবেচারা লোকের ওপর আক্রোশ হয় কখনও ? আজই মন্দিরা বলে দেবে গড়গড়িকে এবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। হোক সে বিধান সভার সভ্য ; বোয়াল মশাইর এ অপমান মন্দিরা কখনও সইবে না।

খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরা খালের ধারে চলল আম গাছের তলা দিয়ে। গাছের ওপরে বসে বোয়াল মশাই দেখলেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

॥ আঠারো ॥

বোয়াল মশাইর গাড়ি নিয়ে রুবি স্টেশনে এসে দেখল বোয়াল মশাই আসেন নি। ওয়েটিং রুম প্ল্যাটফরম রেলের লাইনের এধার ওধার সব দেখে রুবি যখন বাড়ি ফিরছে তখন পথে হঠাৎ দেখা হল অলীকের সঙ্গে।

গাড়ি থামিয়ে রুবি জিজ্ঞাসা করল, একি? তুমি চলেছ কোথায়?

প্যাণ্টের পকেটে দু হাত দিয়ে হেসে অলীক বলল, যাচ্ছি তোমাদের বাড়িতে; চাকরি করতে।

আশ্চর্য হয়ে রুবি বলল, চাকরি করবে তুমি? আমাদের বাড়িতে? মার কাছে?

রুবির শেষ কথাটায় যে শ্লেষ ছিল তা অলীক উড়িয়ে দিল হেসে, এবং প্যাণ্টের পকেটে তেমনি হাত রেখে, একটি পা নাচিয়ে।

বলল, তোমাদের বাড়িতে রাঘব বোয়াল আছেন তা তো আগে বল নি? জান আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী?

রুবি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

বলল, ওঁকে তুমি চেন নাকি? কবে হল এ চাকরি?

অলীক বলল, কালকে উনি চাকরি দিয়েছেন। বলেছেন, আজ সকাল থেকে কাজে লাগতে। তাই আমি যাচ্ছি কাজে জয়েন করতে।

রুবি গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেবে পড়ল। অলীককে রাস্তার এক পাশে নিয়ে ব্যাপারটা সব শুনে নিল আগে, কি শর্তে চাকরি পেয়েছে অলীক বোয়াল মশাইর কাছ থেকে।

অলীক তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছে, জান আমার বস্ বলেছেন, একমাস পরেই মাইনে বেড়ে আড়াইশ হয়ে যাবে যদি আমরা বিয়ে করে ফেলি এক মাসের মধ্যে। তাইত তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে ফেললাম কালই, এই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তোমার বাড়ির কাছে।

শুনে রুবির মনটা বোয়াল মশাইর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। আহা বেচারা! রুবিকে কত ভালই না বাসেন! গড়গড়িকে তিনিই দিতেন সরিয়ে এই অলীককে ঐ বাড়িতে নিয়ে এই বুদ্ধি করে।

এই কথাটা আগে যদি রুবি জানত তাহলে আর অত কষ্ট পেতেন না কাল সন্ধ্যা থেকে বোয়াল মশাই। ঐ রকম ফন্দি করে গড়গড়িকে আর ওঁর পেছনে লাগিয়ে দেবার প্রয়োজনও হত না রুবির। মিছিমিছি ভদ্রলোক এত কষ্ট পেলেন।

অলীক হাতের ঘড়ি দেখে বলল, চল এবার যাই। জয়েন করবার টাইম পেরিয়ে গেল।

রুবি তখন বলল, কোথায় যাবে? বোয়াল মশাই নেই। চলে গেছেন তিনি আমাদের বাড়ি ছেড়ে।

অলীকের চক্ষু দুটি কপালে উঠে গেল। বলল, বল কি? কখন? কেন?

তখন রুবি সব কথা খুলে বলল, কাল সন্ধ্যা থেকে এই স্টেশনে আসা পর্যন্ত।

শুনে অলীক বলল, শিগগির চল তাহলে। নিশ্চয়ই তিনি বাড়িতেই আছেন কোনও খানে লুকিয়ে। চল গিয়ে খুঁজে দেখি।

আমি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। এখন এটাই তো আমার প্রধান কাজ।

গাড়িতে উঠে দুজনে যখন বাড়ি ফিরল তখনও বোয়াল মশাইকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। গড়গড়িকেও না।

মন্দিরা একবার বাগানে আর একবার ঘরে ছুটো ছুটি করেছে, চাকর মালী সবাই খুঁজে দেখেছে কিন্তু বোয়াল মশাইকে কেউ দেখতে পায় নি। গড়গড়িকেও না। দুজনেই যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে হঠাৎ।

বাগানের ধারে বোয়াল মশাই যে গাছটার ওপর বসে আছেন তারই কাছে দাঁড়িয়ে মন্দিরা দেখল রুবি গাড়ি নিয়ে স্টেশন থেকে ফিরল। কিন্তু ওর সঙ্গে ওটা কে?

মন্দিরার চোখ মুখ কঠিন হয়ে গেল। কোমরে দুহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মন্দিরা বেয়াড়া ঐ অলীকের সঙ্গে আগে একটা বোঝাপড়া করে নিতে।

কি আস্পর্দ্ধা ছেলেটার! বারণকরা সত্বেও আবার এসেছে এ বাড়িতে। আসুক একবার কাছে। দেখিয়ে দেবে মন্দিরা তার কথার অবাধ্য হওয়ার মানেটা কি হয়।

অলীক এগিয়ে এল রুবির সঙ্গে হাসি হাসি মুখ করে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই আজ দেখতে লাগল মন্দিরা কোমরে দু হাত দিয়ে।

কি আশ্চর্য! কাছে এসে মন্দিরার এই রুদ্র মূর্তি দেখেও চুপসে গেল না ছেলেটা সেই আগের মত। বরং দিব্বি তাকিয়ে রইল সোজা মন্দিরার চোখে চোখ রেখে, এবং হাসি হাসি মুখ করে।

দেখে রাগে মন্দিরার সর্ব দেহ যেন জ্বলে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মন্দিরা জিজ্ঞাসা করল—

কি চাই ?

অলীক বলল, আমার বস্‌কে।

তেমনি কঠিন দৃষ্টি হেনে ব্যঙ্গ ভরে ঠোঁট বেঁকিয়ে মন্দিরা বলল, কে তোমার বস্ ?

অলীক বলল, রাঘব বোয়াল পাবলিশিং হাউসের একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরাঘব চন্দ্র বোয়াল।

রাগে জ্বলে যেন ফেটে পড়ল মন্দিরা, বোমার মতন। চেঁচিয়ে বলে উঠল, বটে ? বাঁদরামো করবার আর জায়গা পাওনি ? বেরোও, বেরোও শিগ্‌গির বাড়ি থেকে।

এইবার বেচারা অলীকের মুখখানা শুকিয়ে গেল ভয়ে। তর্জনী তুলে এমনি করে তার দিকে মন্দিরাকে এগোতে দেখে অলীক এক পা দু পা করে পিছু হটতে শুরু করল। মনে হল, এখনই বুঝি ছুট দেবে পিছু ফিরে।

হঠাৎ গাছের ওপর থেকে বোয়াল মশাইর গুরু গম্ভীর গলা শোনা গেল, দৈববাণীর মত।

বোয়াল মশাই বললেন, অলীক আমার বেতন ভোগী প্রাইভেট সেক্রেটারী। যতক্ষণ আমি এখানে আছি অলীকও আমার সঙ্গে থাকবে।

যদি আজ ভূমিকম্প হত, অথবা হত বজ্রপাত তবু মন্দিরা এত বেশী চমকে উঠত না, যেমন এখন চমকে উঠল বোয়াল মশাইর গলা শুনে গাছের ওপর থেকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল মন্দিরা। চক্ষু দুটি কপালে তুলে ফিরে তাকাল

ঐ গাছের দিকে। এগিয়ে এল এক পা দু পা করে মন্দিরা, রুবি এবং অলীক। গাছের নিচে এসে দাঁড়াল মুখটি ওপরে তুলে। দেখল, সত্যি বোয়াল মশাই বসে আছেন উঁচু একটি ডালে।

মাটি থেকে এই গাছের গুঁড়ি সোজা ওপরে উঠেছে। দশ ফুটের মধ্যে কোন ডাল নেই। তবু বোয়াল মশাই কি করে যে ঐ গাছে উঠে পড়লেন এই বয়সে কেউ তা ভেবে পেল না।

মন্দিরার মুখে হাসি ফুটল গাছের নিচে এসে, বোয়াল মশাইকে ভাল করে দেখে।

জিজ্ঞাসা করল মন্দিরা, কেমন করে উঠলেন আপনি অত উঁচু ডালে?

বোয়াল মশাই বললেন, প্রাণের দায়ে, ভয়ে।

মন্দিরা হাত নেড়ে বলল, এখন আর ভয় কি? নেবে আসুন শিগগির।

বোয়াল মশাই বললেন, না। নিচে আমি নাবব না কিছুতেই যতক্ষণ গড়গড়ি এ বাড়িতে আছে। লোকটা বদ্ধ পাগল এবং খুনে।

মন্দিরা বলল, ভয় নেই আপনার। গড়গড়ি আজই চলে যাবে এ বাড়ি ছেড়ে।

বোয়াল মশাই বললেন, আগে যাক তারপর নাবব।

এমনি সময় দেখা গেল যুগল চরণ ফিরে আসছে খালের ধার থেকে সর্বাঙ্গ জলে ভিজিয়ে। বোয়াল মশাইর খোঁজে প্রথমে গিয়েছিল যুগল চরণ বাগানে, তারপর খালের ধারে। নৌকোয় চড়ে সারাটা খাল ঘুরে দেখেছে পর্যন্ত। শেষকালে ফেরবার সময় নৌকোর ধারে পা আটকে উল্টে পড়েছে জলে।

তবু তাকে দেখে মন্দিরার মনে দয়া হল না একটুও। করুণাও এল না মনে। দাঁড়িয়ে রইল মন্দিরা তেমনি কঠিন হয়ে।

যুগল চরণ এগিয়ে আসছিল বীরের মত, সহীদের মত। বোয়াল মশাইর প্রাণ বাঁচাতে এত কষ্ট সহ্য করেছে সে আজ সকাল থেকে। ভেবেছিল মন্দিরা এতে খুশী হবে।

কিন্তু কাছে এসে মন্দিরার বিরক্ত ক্রুদ্ধ এই মুর্তি দেখে যুগল চরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণও হল মনে মনে।

তবু গাছের ওপর বোয়াল মশাইকে বসে থাকতে দেখে খুশি হল যুগল চরণ। নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বলল, যাক আপনি ভালই আছেন তাহলে।

কঠিন স্বরে মন্দিরা বলল, দেখুন যুগলবাবু আপনি আর ওঁকে ঘাঁটাবেন না। যা হবার তা হয়েছে। আপনি এখন চলে যান আমার এই বাড়ি থেকে। উনি বলেছেন, আপনি এবাড়ি না ছাড়লে উনি আর নাববেন না।

আহত হল যুগল চরণ গড়গড়ি। বিধান সভার সভ্য সে। বেশ অপমানই বোধহল তার মন্দিরার এই কথায়। ঘাড় ফিরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। একটা কথা মুখেও তার এসেছিল; কিন্তু গাছের ওপর তাকিয়ে বোয়াল মশাইকে দেখে নিজেকে সে সামলে নিল।

মন্দিরার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, এটা আপনার বাড়ি। আপনার নিমন্ত্রনেই আমি এসেছিলাম। এখন আপনার কথাতেই চলে যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, ঐ ভদ্রলোককে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব এখন থেকে সম্পূর্ণ আপনার একার।

এই বলে এগিয়ে এসে যুগল চরণ দেখল রুবি দাঁড়িয়ে আছে অলীকের হাতে হাত ধরে অন্য একটি গাছের আড়ালে।

যুগল চরণের মনে পড়ে গেল, এই ছেলেটিকেই যেন সেদিন দেখেছিল মাতঙ্গী সিনেমায় রুবির পাশের সিটে।

মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেলল সব গড়গড়ি। কটমট করে একবার সে ফিরে তাকাল গাছের তলায় ঐ মন্দিরার দিকে; তারপর রুবি ও অলীকের দিকে।

রুবি অলীকের হাত ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল, চাকরকে বলে দিয়েছি আপনার জিনিস পত্তর সব বাঁধা ছাঁদা করতে। ড্রাইভারকেও বলে দিচ্ছি হাজির থাকতে। আপনি তাহলে এবার তৈরী হয়ে নিন যুগলবাবু তাড়াতাড়ি।

জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে যুগল চরণ বাড়ির দিকে ছুটে চলল।

পেছনে ধীরে সুস্থে চলল রুবি। আর তার পাশে অলীক। মোড় ঘুরে বাড়ির সামনে এসে পিছন ফিরে রুবি যখন দেখল মন্দিরাকে আর দেখা যায় না, তখন অলীকের হাতখানা টেনে নিজের হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল দোলাতে দোলাতে।

গাছের ওপর থেকে এই দেখে বোয়াল মশাইর মনটাও আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল।

নিচে দাঁড়িয়ে রুবির পাশে অলীককে গাছের আড়ালে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতে আগেই দেখেছে মন্দিরা; তাই মনটাও তার আর্দ্র হয়েই ছিল সেই থেকে।

এখন এই গাছতলাটা নির্জন। গাছের ওপরে বোয়াল মশাই বসে। নিচে মন্দিরা।

অলীকের হাত ধরে রুবিকে অমন করে নাচতে নাচতে এগিয়ে

যেতে দেখে বোয়াল মশাই আর নিজের মনের কথা চেপে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেন, বেশ মানাবে কিন্তু ওদের দুজনকে। তাই না?

মন্দিরাও মনে মনে এই কথাটাই ভাবছিল এতক্ষণ ধরে। বোয়াল মশাইর কথায় মন্দিরার বুকের ভেতর থেকে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, ফোঁস করে।

এই শব্দ শুনে বোয়াল মশাই চমকে উঠলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মন্দিরার দিকে গাছের ডালে বসে।

মন্দিরা বলল, হ্যাঁ ওদের বেশ মানাবে। এইবার আপনি নেবে আসুন দেখি তাড়াতাড়ি?

বোয়াল মশাইর চমক ভাঙ্গল। খেয়াল হল, যে ভাবে তিনি উঠে এসেছেন প্রাণের ভয়ে, সে ভাবে আর নাবতে পারবেন না কিছুতেই। কাজেই নাবতে হলে এখন একটি মই চাই। কিন্তু এ বাড়িতে এত উঁচু মই আছে কি?

নিচে থেকে মন্দিরা আবার তাগাদা দিয়ে বলে উঠল, কৈ নাবুন শিগগির। আর কতক্ষণ বসে থাকবেন ওখানে?

বোয়াল মশাই হেসে বললেন, বলেছি তো গড়গড়ি যতক্ষণ এ বাড়িতে আছে ততক্ষণ আমিও এখানেই থাকব।

মন্দিরা ব্যস্ত হয়ে বলল, গড়গড়ি তো চলে যাচ্ছে এক্ষুনি। না না, আপনি নেবে আসুন প্লিজ।

বোয়াল মশাই বললেন, বেশ তো, আগে ও চলে যাক, তারপর একটা মইএর ব্যবস্থা হোক, তবে তো নাবব!

বিস্মিত হয়ে মন্দিরা বলল, সেকি? মই না হলে নাবতে পারবেন না আপনি? তাহলে উঠলেন কি করে মই ছাড়া?

বোয়াল মশাই তেমনি হেসে বললেন, বিপদে মানুষ সব পারে। এই দেখুন না, যদি একটা বাঘ ঐ খালের ধার থেকে তেড়ে আসে, আর বলে হালুম, তাহলে আপনিও এক্ষুনি এক লাফে এই গাছে চড়ে বসবেন প্রাণের ভয়ে।

মন্দিরা ভয়-চকিত দৃষ্টিতে খালের দিকে একবার তাকিয়ে আবার মুখ তুলে বলল, যত সব বাজে কথা আপনার। মিছিমিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। নিজে যে অত উঁচু ডালে চড়ে বসতে পারে তার আবার নাববার সময় মই লাগে কখনো?

বোয়াল মশাই এইবার একটু বিব্রত বোধ করলেন।

শুকনো মুখে বললেন, আমার যে বয়েস হয়েছে এবং বুড়ো হয়েছি সে কথাটা মানবেন তো? বিশ্বাস করুন, সত্যি আমি নাবতে পারব না, মইছাড়া।

মন্দিরা তবু একথা আমল দিল না। রাগের ভান করে বলে উঠল, রাখুন রাখুন। আপনার সব চালাকি আমি জানি। এই বয়সে যে দু ঘণ্টা ধরে নৌকো চালাতে পারে, দৌড়ে জানালা টপকে ছুটে এসে অত উঁচু গাছে চড়ে বসতে পারে, সে আবার বুড়ো হয় কি করে? ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। শিগগির নেবে আসুন বলছি, নইলে আমি কিন্তু—

মন্দিরার এই কৃত্রিম রাগ দেখে মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলেন বোয়াল মশাই। খুবই ভাল লাগল তাঁর মন্দিরার এই শাসানি। ইচ্ছে হল ওকে আরও একটু রাগাতে।

তাই তিনি হেসে বললেন, যদি না নামি কি করবেন আপনি? উঠে আসবেন এই গাছে?

মন্দিরা তেমনি শাসিয়ে তির্যক ভঙ্গি করে বলল, আপনি তাহলে নাববেন না ?

বোয়াল মশাই বললেন, না।

মন্দিরা বলল, বেশ থাকুন আপনি বসে। আমিও বসছি এই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। দেখি কে আমাকে ওঠায় এখান থেকে।

এই বলে মন্দিরা দুম দুম করে এসে গাছের নিচে হেলান দিয়ে বসল, পা দুটি গুটিয়ে হাঁটুতে দুহাত দিয়ে।

বোয়াল মশাই প্রমাদ গুনলেন।

মন্দিরা যে তাঁর কথাটা এমনি করে উড়িয়ে দিয়ে সহসা এরকম একটি কাণ্ড করে বসবে বোয়াল মশাইর তা কল্পনারও অতীত। বিচলিত হলেন বোয়াল মশাই। কিন্তু কি অদ্ভুত এই অনুভূতি! সারা দেহে তাঁর রোমাঞ্চ হল। মন্দিরা তাহলে সত্যি ভাবে, তিনি বুড়ো নন। এখনও বেশ জোয়ান! কিন্তু তাই বলে মইছাড়া তিনি নাববেন কি করে ? না না সে তিনি পারবেন না। তাহলে এখন উপায় ?

বোয়াল মশাইর হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর ব্রহ্মাস্ত্রটির কথা। মন্দিরার বই ছাপানোর কথা। ভেবে দেখলেন, এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। এক্ষুনি তাঁকে প্রয়োগ করতে হবে মোক্ষম এই অস্ত্রটি সামান্য একটা মই পাবার আশায়। না হলে কতক্ষণ আর তিনি বসে থাকবেন এই গাছের ওপর ? এই অস্ত্রটি ছাড়লেই মন্দিরা আর বসে থাকতে পারবে না। ছুটে যাবে মই আনতে এক্ষুনি।

কাজেই তিনি বলে উঠলেন, থাক থাক আপনাকে আর অত কষ্ট করতে হবে না। ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে হবে না আমার জন্য। আপনার লেখা উপন্যাস এমনিই আমি ছাপিয়ে দেবখ'ন।

এইবার একটা মই আনুন দেখি, লক্ষ্মী মেয়ের মতন, চট করে ?

কিন্তু বোয়াল মশাইর আশাপূর্ণ হল না। মই আনতে ছুটে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না মন্দিরার মধ্যে। মইএর কথা সে যেন ভুলেই গেল নিজের মনের উল্লাসে।

গাছের গুঁড়ি থেকে ছুটে এল মন্দিরা হাত দুটি পেছনে রেখে। বোয়াল মশাইর ডালের নিচে এসে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলল—

সত্যি বলছেন ? দেবেন আপনি আমার লেখা সব উপন্যাস ছাপিয়ে ?

বোয়াল মশাই বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেব।

মন্দিরা বলল, পর পর পাঁচখানা ?

পাঁচখানা উপন্যাসের কথা শুনে যদিও বোয়াল মশাইর চোখ দুটি কপালে উঠে গেল, ঠোঁট দুটিও একটু ফাঁক হল বিস্ময়ে, তবু তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মন্দিরা বলল, আর পঞ্চাশটি ছোট গল্প ?

ব্যস্ত হয়ে বোয়াল মশাই বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তাও ছাপিয়ে দেব। ওসব আপনি ভাববেন না কিচ্ছু। এইবার যান দেখি, একটা মইএর বন্দোবস্ত করুন।

মন্দিরা যেন ছোট্ট খুকীটির মত আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। শাড়ির আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে দুহাতে তালি দিয়ে বলে উঠল—

বাঃ কি মজা। আমার বই এবার ছাপা হবে। সত্যি আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা বোয়াল মশাই।

বোয়াল মশাই বললেন, একটা মই আনুন শিগগির তাহলেই আমি ধন্য হব।

মন্দিরা বলল, আচ্ছা আপনি কি করে জানলেন আমার লেখা উপন্যাস আছে অথচ ছাপানো হয় নি? আমি তো কক্ষনো বলিনি সেকথা?

বোয়াল মশাই যদিও বইএর জন্য ব্যস্ত হয়েছেন মনে মনে, তবু মন্দিরার এই উল্লাস দেখে আর আবদারের সুরে এই কথা শুনে বেশ একটু পুলকিত হয়ে উঠলেন।

হেসে বললেন, লেখকের মনের কথা প্রকাশক যদি না বোঝে তাহলে আর বুঝবে কে? আপনার মনের কথা আমি বুঝেচি অনেকদিন আগে, সেই যেদিন আপনি প্রথম চিঠি লেখেন নীল খামে। সে খাম এবং চিঠি এখনও আমার কাছে আছে। আপিসের ড্রয়ারে।

অপূর্ব এক ভঙ্গি করে হেসে মন্দিরা বলল, তাই নাকি? তাহলে বলুন দেখি এখন আমার মনের কথা কি?

এইবার বোয়াল মশাই কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

বললেন, কেন? আমাকে দিয়ে আপনার সব বই ছাপিয়ে নেওয়া।

মন্দিরা বলল, ছাই বুঝেচেন। বই ছাপালেও আমি এখানে বসে থাকব যতক্ষণ আপনি নেবে না আসেন। এই আমি বসলাম।

এই বলে মন্দিরা আবার গিয়ে বসল গাছের সেই গোড়ায় আগেকার মত হেলান দিয়ে। মুখে তার ফুটে উঠল মধুর একটি হাসি। কটাক্ষে একবার সে বোয়াল মশাইকে দেখে আবার সামনে তাকিয়ে দু-হাতে হাঁটু দুটি ধরে দুলতে লাগল নিজের মনের আবেগে।

গাছের ওপর বসে মন্দিরার এই নতুন রূপটি দেখে বোয়াল মশাই

মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিদ্যুত ঝলকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল মন্দিরার মনের গোপন কথাটি আজ বোয়াল মশাইর কাছে।

ঝোঁকের মাথায় তিনি উঠে পড়েছিলেন এই গাছে, নিজের প্রাণ বাঁচাতে, দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে। পরে আর নেবে আসতে সাহস পান নি এতক্ষণ। তাই একটা মই-এর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

মন্দিরার মনের কথাটি হঠাৎ এখন বুঝতে পেরে আবার তাঁর রোমাঞ্চ হল সর্ব দেহে, অনির্বচনীয় এক পুলকে। বুকের ভেতরটা আবার আজ দুমড়ে মুচড়ে উঠল ঠিক সেইদিনকার মত, যে দিন তিনি বুঝেছিলেন এ মোচড়ানো আর সেই বুকের ব্যামো নয়। মনে হল, বয়েস তাঁর কমে গেছে কমসে কম পনেরোটি বৎসর।

মন্দিরার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি হেনে সোল্লাসে তিনি বলে উঠলেন, অ্যাঁ, তাই নাকি? তাহলে এক্ষুনি আমি নেবে আসছি। এই মুহূর্তে।

এই বলে গাছের একটি ডাল ধরে ঝুপ করে তিনি নেবে পড়লেন অক্ষত দেহে। তারপর পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন মন্দিরার পাশে।

পাশে ঘেঁষে বসল মন্দিরা। মন্দিরা কটাক্ষ হেনে বলল, এই না বলছিলেন মই না হলে নাবতে পারবেন না?

সারা অঙ্গে মধুর এক শিহরণ হল বোয়াল মশাইর। মন্দিরার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে তিনি একটু চাপ দিলেন। মুখে তাঁর কথা জোগাল না। তাকিয়ে রইলেন তিনি গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটার দিকে, মন্দিরার হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে।

দেখলেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁরই গাড়িখানা। ড্রাইভার

দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। আর খদ্দরের পোশাক পরা যুগল চরণ পা বাড়িয়েছে ভেতরে।

বুকের ভেতর থেকে রুদ্ধ একটি নিঃশ্বাস ফস করে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অপরিসীম তৃপ্তির দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন আজ রাঘবচন্দ্র বোয়াল।

(ওডহাউসের অনুসরণে)